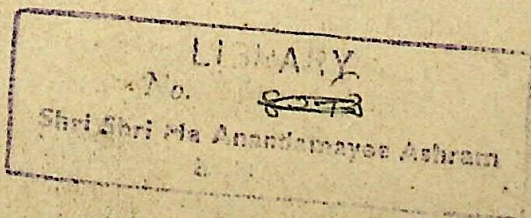


PRESENTED

ভাগবত-জীবন

11/5

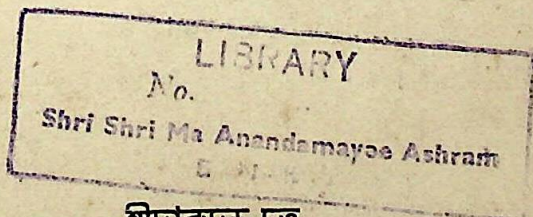


শ্রীচরিত্র দত্ত

ভাগবত-জীবন

11/5

(শ্রীঅরবিন্দের Life Divine-এর সর্বশেষ
পরিচ্ছেদের মূল কথা)



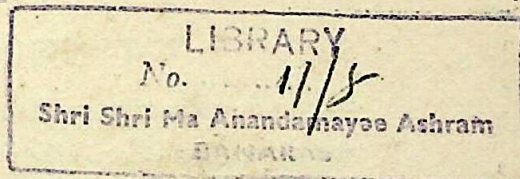
শ্রীচাক্রদ্র দত্ত

প্রকাশক :—

শ্রীচরুচন্দ্র দত্ত

৭, নাভনক প্লেস, কলিকাতা।

আট আনা।



ভাগবত-জীবন

Life Divine গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের আরম্ভে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন যে মানব বহু বহু যুগ পূর্বেই সন্ধান পাইয়াছিল—জরা মৃত্যু শোক তাপ স্নেহ দুঃখের অতীত এক দিব্য জীবনের, দিব্য লোকের। শুধু যে সন্ধান পাইয়াছিল তাহা নহে, সেই উর্দ্ধতম লোকে যে সে উঠিতে পারে—এরূপ প্রতীতিও তাহার জন্মিয়াছিল। সেই অর্দ্ধপরিণত আদিম মানব আর নাই, আজ তাহার বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণ ও মার্জিত, সে প্রকৃতির সহিত অহরহ যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছে, প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ আজ দাসী-বান্দীর মত তাহার আজ্ঞাপালন করিতেছে। শুধু তাহাই নয়,

মনোরাজ্যেও তাহার শক্তি অপ্রতিহত, তাহার দৃষ্টি আজ সুদূরপ্রসারিত। সে পরিবার গোষ্ঠী জাতি প্রভৃতি ক্রমবর্ধমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘটনে কৃতকার্য হইয়া মহাজাতি সংঘটনে মনোনিবেশ করিয়াছে, জগৎব্যাপী এক অখণ্ড সম্মিলিত রাষ্ট্রেরও স্বপ্ন সে আজ দেখিতেছে। এই পরিচ্ছেদে শ্রীঅরবিন্দ মানবের বহুসহস্রবৎসরব্যাপী সংগঠন প্রচেষ্টা, একটীর পর একটী বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন, কেন মানুষ সমগ্র নরজগতের মঙ্গলের জন্য এক হইতে পারে নাই, গলদ কোথায় এবং কেন ?

জড়বস্ত্ত হইতে যুগযুগান্তব্যাপী ক্রমিক পরিণতির ফলে যেদ্রুপ পূর্ণদেহ পূর্ণমস্তিষ্ক মানবের উদ্ভব হইয়াছিল, তেমনই আজ বহু শতাব্দী ধরিয়া সেই বুদ্ধিজীবী পূর্ণমানবের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অভিব্যক্তি চলিয়া আসিয়াছে। এই সমস্ত সময়টা মানুষ যে মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া তাহার আদিমতম দিব্য আত্মাহুকে (aspiration) ভুলিয়া রহিয়াছে, তাহাও

ভাগবত-জীবন

৩

ঠিক নয়। বরং যুগে যুগে নানারূপে সে বিশ্বাতীত পরম সত্যের সন্নিকটস্থ হইতে চেষ্টা করিয়াছে। কখন তাহার ঐহিক ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্য এক হইয়াছে, কখনও বা সে দুই বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়াছে। তথাপি উর্দ্ধগমনের এই যে মাহুষের নানামুখা প্রচেষ্টা, ইহা এপর্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছে বলিলে ভুল হয় না। কেন, তাহা শ্রীঅরবিন্দ এই পরিচ্ছেদে বুঝাইয়াছেন।

মানবজাতির সংস্কৃতির অভিব্যক্তি নির্ভর করিতেছে, ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও উৎকর্ষের উপর—
the individual is indeed the key of the
Evolutionary movement. কারণ, ব্যক্তিগত মানবচেতনা অন্তর্মুখী হইবে, তাহার মধ্যে পরম সত্যের আলোক অবতরণ করিবে, তবে না সমগ্র জাতির মধ্যে ভাগবত-জীবনের প্রতিষ্ঠা ঘটিবে!

অতএব প্রথমেই দেখিতে হইবে যে অচেতন বা অবচেতন জড়জগতের আবেষ্টনে যে আমাদের মত

একটা সচেতন সত্তার অবস্থান—তাহার অর্থ কি, তাহার পশ্চাতে কি সত্য নিহিত রহিয়াছে? এই অবস্থান, এই অস্তিত্ব, কি জড়শক্তির খেলা মাত্র কিবা বিশ্বকর্মার খেলা মাত্র?

If there is a Being that is becoming, a Reality of existence that is unrolling itself in Time, what that Being, that Reality secretly is, is what we have to become, so to become is our life's significance.

যদি ইহা সত্য হয় যে এক অখণ্ড অনন্ত সং দেশকালের মধ্যে বহুরূপে ব্যক্ত হইয়াছেন, তাহা হইলে সেই অখণ্ড সত্যের বাহা যথার্থ স্বরূপ, সেই স্বরূপ আনাদিগকেও লাভ করিতে হইবে। ইহাই আমাদের ইহজীবনের তাৎপর্য। এক সতের বহুরূপে প্রকট হওয়ার পশ্চাতে যে সত্য, তাহাই আমাদের জীবনের অর্থ। সেই অর্থের দ্বারাই নির্দিষ্ট আমাদের নিয়তি। এই যে নিয়তি, ইহা আমাদের বর্তমান সত্তাতে বীজ-

ভাগবত-জীবন

৫

রূপে অন্তর্নিহিত, যদিচ আমরা তাহা উপলব্ধি করি না। গুরুবর বলিতেছেন, Our destiny is something that already exists in us as a necessity and a potentiality.

দেশকালাতীত বস্তুর দেশকালের সীমার মধ্যে যে পরিণতি ঘটতেছে, তাহার মূলে দুইটি তত্ত্ব,—চেতনা ও প্রাণশক্তি। এই দুই তত্ত্বকে গুরুবর বলিতেছেন key-words to what is being worked out in Time. এই তত্ত্ব দুটিকে বাদ দিলে জড়জগতের কোন অর্থ থাকে না, বিশ্ব হইয়া যায় একটা আকস্মিক ব্যাপার বা নিশ্চেতন জড়শক্তির ক্রীড়া।

তবে আজ আমাদের চেতনা ও প্রাণ যাহা, তাহাই শেষ কথা নয়। কেন না—তাহারা ত অপরিণত, তাহাদের ক্রমোত্তরণ চলিতেছে। মানবের মন, মানবের চেতনা অপূর্ণ ও অবিচ্ছিন্ন। এই চেতনার আরও অপূর্ণ রূপ পূর্বে ছিল, অপূর্ণপরিণত রূপ ভবিষ্যতে আসিবে—self luminous, জ্যোতিষ্মান।

৬

ভাগবত-জীবন

আমাদের যে চেতনা তাহা মূল নিশ্চেতন অবস্থা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, এখনও অজ্ঞান-অচ্ছন্ন। এই অবস্থা হইতে স্বতঃ-ভাস্বর দিব্যমানসে ক্রমোত্তরণ আমরা বুঝিতে পারিব, যদি আমরা উপলব্ধি করি যে মূল অজ্ঞানের মধ্যেও এই দিব্যমানস প্রচ্ছন্ন প্রস্তুতরূপে নিহিত ছিল।

পূর্ণ-পরিণত বিজ্ঞান স্বভাবতই আত্মজ্ঞ, স্বতঃ-ভাস্বর। কেন না তাহা চরম সত্যের, পরমাত্মনের চেতনা, যাহা আমাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে ও ধীরে ধীরে প্রকট হইতেছে। গুরুবরের ভাষায়, For that evidently must be the consciousness of the Reality, the Being, the Spirit, that is secret in us and slowly manifesting here.

চেতনা যদি হয় সৃষ্টির অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্য—তবে প্রাণ তাহার বাহ্যিক কার্য্যকরী শক্তি। Life is the exterior and dynamic sign. কিন্তু যেমন আমাদের মন অপরিণত ও অপূর্ণ, আমাদের

ভাগবত-জীবন

৭

প্রাণও ত তেমনই ! মানবের জীবন imperfect বা
 অসম্পূর্ণ, কেন না তাহার মন সতের চেতনার নিম্নতর
 প্রকাশ মাত্র। কিন্তু এই মন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেও
 তাহার অবাঞ্ছিত অনবাঞ্ছিত রহিল, কেন না যে তত্ত্বের
 বিক্ষেপে অবতরণ ঘটয়াছে তাহা মন নয়—আত্মা এবং
 গুরুবরের কথায়, mind is not the native
 dynamism of consciousness of the spirit.
 আত্মার চেতনা কাজ করে মন দিয়া নয়, দিব্যমানস
 দিয়া। এই দিব্যমানস বা Gnosis-এর আবাহনই
 দিব্যজীবন প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়।

All spiritual life is in its principle a
 growth into divine living. দিব্যমানসের
 জাগরণ মানেই দিব্যজীবনের প্রতিষ্ঠা, আধ্যাত্মিক
 জীবনের সূত্রপাত। মন ও দিব্যমানসের মধ্যবর্তী
 সীমা নির্দেশ করা কঠিন। বাঁধাধরা কোন সীমা
 নাই। মনে প্রাণে দিব্য আলোকের সঞ্চার আরম্ভ
 হইলেই they put on or reflect something

of the divinity, মনপ্রাণ ধীরে ধীরে দিব্যরূপ পরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করে, ক্রমশঃ সমগ্র সত্তা জ্যোতির্শরয় হইয়া উঠে। কিন্তু পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্য মনপ্রাণ দেহকে দিব্য আলোকে পুনর্গঠিত করিয়া লইতে হইবে, নবীন ভাষার রূপ দিতে হইবে। আবার শুধু ব্যক্তিগত পূর্ণতা আসিলেও হইল না। বিজ্ঞানময় মানবের সমষ্টি ও সমাজ গঠন করিয়া সৃষ্টির ক্রমোত্তরণকে সার্থক করিতে হইবে। গুরুবরের ভাষায়, a collective life of gnostic being established as a highest power and form of the becoming of the spirit in the earth nature. আমাদের অন্তরে এমন স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে যাহা বাহিরের রূপের উপর নির্ভর করিতেছে না। অন্তরের জ্যোতি অবশ্য কতকটা বাহিরের কার্যে প্রতিকলিত হইবে। তবে এরূপ হইলেও শুধু ব্যক্তিগত মুক্তি বা পরিণতি সাধিত হইল, আবেষ্টন অপরিবর্তিত রহিল। ইহাকে total consummation বা পূর্ণ

ভাগবত-জীবন

৯

অভিব্যক্তি বলা যায় না। গুরুবর এই পূর্ণতম অভিব্যক্তির লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন—a greater dynamic change in earth nature itself, a spiritual change of the whole principle and instrumentation of life and action, the appearance of a new order of beings and a new earth life, জড়প্রকৃতির জড়তা পরিহার, প্রাণশক্তি ও তাহার ক্রিয়ার ভাগবত রূপপরিগ্রহ, নবমানবের আবির্ভাব ও জগতে নবজীবনের প্রতিষ্ঠা, ইহাই হইল চরম পরিবর্তন। ইহার পূর্বের খণ্ড খণ্ড পরিবর্তনগুলিকে এই চরমে উঠিবার ধাপ বলা যাইতে পারে। এই চরম অভিব্যক্তিকে গুরুবর বলিয়াছেন a gnostic way of dynamic living—জড়তা মাত্রের সম্পর্কহীন বিজ্ঞানময় জীবন ধারা।

বিজ্ঞানময় জীবন সক্রিয় বটে। কিন্তু তথাপি মনে রাখিতে হইবে যে এই জীবনের ভিত্তি স্বভাবতঃ সদাই অন্তর্মুখী, বহির্মুখী নয়। এই অন্তর্মুখী ভাব,

আধ্যাত্মিক মূল, spiritual origination, ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। আমাদের বর্তমান বহিমুখী জীবনে মনে হয় যেন বিশ্ব আমাদের স্রষ্টা, কিন্তু আধ্যাত্মিক দিব্য-জীবনে আমরাই আপনার, তথা বিশ্বের, স্রষ্টা। সৃষ্টির এই মর্শ্ব উপলব্ধি হইলে সহজেই বোঝা যায় যে inner life অন্তর্জীবনই বড় জিনিস, বাকী যাহা— তাহা এই অন্তর্জীবনের প্রকাশ ও পরিণাম মাত্র। আমাদের পরিণতি লাভের প্রচেষ্টায় এই ব্যাপার স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বাহিরের প্রকৃতি জড় মূক অন্ধ অবিজ্ঞান; তাহারই মাঝে আমাদের বাস, অথচ আমরা নিরন্তর অনুভব করিতেছি যে অন্তরে কি একটা শক্তি আমাদের আবেষ্টন অতিক্রম করিয়া পূর্ণতার পানে লইয়া চলিয়াছে!

গুরুবর বলিতেছেন, Thus to look into ourselves, enter into ourselves and live within is the first necessity for transformation of nature and for the divine life.

আমাদের স্বভাব পরিবর্তন করিয়া ভাগবত-

জীবন প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন—অন্তরের দিকে দৃষ্টি, অন্তরে প্রবেশ ও অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বাস। সাধারণ বহিমুখী চেতনার পক্ষে এ কাজ দুঃস্বপ্ন। কিন্তু গতাস্তরও নাই। জড়বাদী বলেন যে দৃশ্যমান বাহিরের জগৎই একমাত্র নিরাপদ স্থান, চেতনাকে বহিমুখী রাখাই ভাল, ভিতরে যাওয়া মানেই ত তমসচ্ছন্ন শূন্যতাতে প্রবেশ, সমতা হারান, নিরানন্দ নির্জীব মনোভাব! তাঁহার মতে প্রাকৃতিক জগৎই একমাত্র সত্য, তাহার উপর দাঁড়াইয়া ভিতরের যেটুকু দেখা যায় তাহাই নিরাপদ। এ রকম ভীষণ মন অন্তর্মুখী হইবে কেমন করিয়া!

তেনমই ক্ষুদ্রচেতা মানুষেরও গোলযোগ আছে। তাহার মন অন্তরের পানে ফিরাইলে সে দেখিবে—
শুধু আপন প্রাণ, আপন মন—Life-ego, mind-ego—আধ্যাত্মিক সত্তা তাহার নজরে পড়িবে না। যেমন নিয়ত বাহিরে বাস করিয়াছে, তাহার দশাই এই। অন্তর সম্বন্ধে তাহার ধারণা বাহিরের

অভিজ্ঞতার উপরই গঠিত। গুরুবরের ভাষায়,
It has a constructed internal experience
which depends on the outside world for
the materials of its being.

কিন্তু যাহার সত্তার মধ্যে অন্তরে বাসের—a
more inner living-এর—ক্ষমতা জাগ্রত হইয়াছে,
সে ভিতরে অন্ধকারও দেখিবে না, শূন্যতাও দেখিবে
না। সে পাইবে, an enlargement, a rush of
new experience, a greater vision, a
richer delight, a larger capacity, a life
more real and various than what he has
experienced outside. অর্থাৎ চेतনার বিস্তার,
নব নব অভিজ্ঞতা যুদ্ধতর দৃষ্টি, পূর্ণতর আনন্দ,
সত্যতার বৈচিত্র্যময় জীবন।

ভিতরে যে নীরবতা ও শূন্যতা আছে তাহাতে
ক্ষুদ্র চিন্তা ভয় পাইতে পারে, কিন্তু সে নীরবতা
আত্মাপুরুষের নীরবতা, তাহা আনিয়া দেয় গভীরতর
জ্ঞান শক্তি ও আনন্দ। সে শূন্যতা শূন্যতা নয়,

ভাগবত-জীবন

১৩

কেন না আধারকে দেবলোকের অমৃতে পূর্ণ হইবে
 বলিয়া তাহার মধ্যের সমস্ত আবর্জনা ফেলিয়া দিয়া
 প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। গুরুবরের অনুপম
 ভাষায়, Silence is the silence of the spirit
 which is the condition of a greater
 knowledge power and bliss, the emptiness
 is the emptying of the cup of our natural
 being, a liberation of it from its turbid
 contents—so that it may be filled with
 the wine of God.

এই যে অন্তরের মধ্যে বাস, ইহার অর্থ বন্ধন নয়,
 মুক্তি—সং হইতে অসতে প্রবেশ নয়, বৃহত্তর মহত্তর
 সত্তাতে প্রবেশ, যথার্থ বিশ্বজনীনতার পানে প্রথম
 পদক্ষেপ। বহিমুখী চেষ্টা দ্বারা বিশ্বচেতনার সহিত
 এক হওয়া যায় না। যাহা মনে হয় নিরহঙ্কার, তাহাও
 অনেক সময়ে অহঙ্কারের সূক্ষ্মতর রূপ মাত্র। বহিমুখী
 মানুষ আপনার সত্তা, আপনার কল্পনা অপরের উপর
 চাপাইতে যায়। পরের কাজ যাহা করিতে যায় তাহা

আংশিক ভাবে, তাহার প্রেরণা অপূর্ণ। কেন না
 সেথায় হৃদয় মনের যোগ আছে বটে, কিন্তু অভিন্নতা
 নাই। আপন পরের ভেদ ঘোচে নাই। গুরুবর
 বলিতেছেন, our being does not embrace
 the being of others as ourselves.
 আধ্যাত্মিক জীবন প্রতিষ্ঠিত হইলে, ব্যাপার সম্পূর্ণ
 বিপরীত হইয়া যাইবে। কারণ তখন প্রেরণা আসিবে
 অন্তরের অনুভূতি হইতে, অন্তরের একত্ববোধ হইতে,
 তখন পরও বাহ্য আপনিও তাহা। গুরুবরের
 ভাষায়, it bases its action in the collective
 life upon an inner experience and inclu-
 sion of others in our own being, an inner
 sense of reality and oneness.

দিব্যজীবনে বিজ্ঞানময় মানব অপরের মন প্রাণ
 দেহকে আপনারই বলিয়া জানিবে। সে কাজ
 করিবে বাহিরের দরদ ভালবাসার প্রেরণাতে নয়,
 অন্তরের একত্ব-বোধের ফলে, সবার হৃদয়ে যে ব্রহ্ম

ভাগবত-জীবন

১৫

বিরাজমান তার জন্ত—*for the Divine in others and the Divine in all.*

The gnostic being finds himself not only in his own fulfilment which is the fulfilment of the Divine Being and Will in him, but in the fulfilment of others.

বিজ্ঞানময় মানব কাজ করে শুধু তাহার আপন হৃদিস্থিত নারায়ণের তুষ্টির জন্ত নয়, সকলের তুষ্টির জন্ত, সকলের সার্থকতার জন্ত। আসল কথা তাহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই, সে নিজের জন্ত কি করিতে পারে! সে সর্বত্র ব্রহ্মকে দেখিতেছে, ব্রহ্মের ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে বুঝিতেছে। তাহার কাজ মানে তাহার অন্তরস্থ দিব্যজ্যোতি ও দিব্য ইচ্ছাশক্তিরই কাজ। This universality in action is the law of his Divine living—এই বিশ্বজনীন ভাবই তাহার ভাগবত-জীবনের বিধি।

ভাগবত-জীবনের প্রতিষ্ঠার জন্ম তাহা হইলে তিনটি বস্তুর প্রয়োজন। প্রথম—ব্যক্তির পূর্ব পরিণতি অন্তরে, বাহিরে। দ্বিতীয়—ব্যক্তি ও তাহার আবেষ্টনের মধ্যে পূর্ণ-সঙ্গতি। তৃতীয়—নবীন জগতের প্রতিষ্ঠা ও সেই জগতে পূর্ণতম সমবেত জীবন।

প্রথমটি আসিলেই দ্বিতীয়টি আসিবে। পূর্ণ-পরিণত ব্যক্তি সহজেই তাহার আবেষ্টনের সহিত সঙ্গতি আনিতে পারিবে। কিন্তু জগতে দিব্যজীবন আনিতে হইলে নবীন সমাজ, new common life-এর প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। নবীন সমাজ মানে কি? আজ আমাদের যে সমস্ত সমাজ গোষ্ঠী জাতি রাষ্ট্রাদি আছে, তাহা নয়। এ সকলকে শ্রীঅরবিন্দ physical collectivity, বাহ্যিক সমবায়, বলিয়াছেন। ইহাদের মূলে রহিয়াছে—এক লক্ষ্য এক সংস্কৃতি, একই প্রকার জীবন ধারা ইত্যাদি।

বিজ্ঞানময় মানবের সমাজ একরূপ বাহ্যিক ব্যাপার হইবে না। সেখানে বগড়াবাঁটি, বে-বনতির কোন

ভাগবত-জীবন

১৭

সম্ভাবনা থাকিবে না, মিটমাট জোড়াতালিরও কোন
 প্রয়োজন হইবে না। তাহা হইলে সে সমাজের বন্ধন
 কি হইবে? গুরুবর বলিতেছেন, All will be
 united by the evolution of the Truth-
 consciousness in them. * * * They will
 feel themselves to be embodiments of a
 single self, souls of a single Reality.
 অর্থাৎ ঋতচিতের জাগরণে তাহারা এক হইবে।
 তাহারা অনুভব করিবে যে তাহারা বহু দেহে একই
 আত্মার প্রকাশ, একই চরম সত্যের বহু রূপ। সে
 সমাজে শৃঙ্খলা থাকিবে, বিধিবিধান থাকিবে, কিন্তু
 সব আত্ম-নিয়ন্ত্রিত, স্বভাবজাত। বিজ্ঞানময় জীবের
 সমাজ গঠিত হইবে তাহারই অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক
 শক্তিসমূহের দ্বারা, সমাজের জীবনধারা কার্যধারা
 হইবে স্বতঃস্ফূর্ত। অথচ mechanisation বা
 standardisation তাহার লক্ষণ হইবে না—যন্ত্রবৎ
 হইবে না সে সমাজ, বৈচিত্র্য থাকিবে বিস্তর,
 সবাইকে এক ছাঁচে ঢালাই করিতে হইবে না।

অন্তরের অনুভূতি, অন্তরের দিব্যজ্ঞান, অন্তরের প্রেরণা থাকিবে এক, কিন্তু তাহার প্রকাশ হইবে নানারূপী, বিচিত্র। তথাপি সে সমাজে কোন বিরোধ বা বিশৃঙ্খলতা ঘটবে না। ঘটতে পারিবে না। কারণ অন্তরে যে একই সত্য সদাজাগ্রত ! গুরুবরের ভাষায়, a diversity of one Truth of knowledge and one Truth of life would be correlation and not an opposition. ব্যক্তিগত মতামত, ব্যক্তিগত ইচ্ছা, ব্যক্তিগত স্বার্থের ধাক্কাধাক্কি ধ্বস্তাধ্বস্তি সেখানকার দিব্যশান্তি নষ্ট করিবে না। সবটা হইবে একই সত্যের একই আত্মনের বিচিত্র বিকাশ, খাঁটি সোনা, অহমিকার খাদ তাহাতে থাকিবে না। গুরুবরের কথায়, no ego insistence on personal idea and no push and clamour of personal will and interest. বিশ্বজনীন ভাবের সাথে থাকিবে একটা ব্যক্তিগত নমনীয়তা, অন্তরের একত্বের সাথে থাকিবে বাহিরের বৈচিত্র্য। অন্তরের সত্যের উপর

ভাগবত-জীবন

১৯

বাহিরের উপর কোন প্রভাব থাকিবে না। বিজ্ঞানে জাগ্রত gnostic মানবের তার আবেষ্টনের সঙ্গে অসঙ্গতি কিছুতেই হইবে না, বাহাই কেন তাহার স্থান হউক না gnostic সমষ্টির মধ্যে। প্রয়োজনমত সে নেতাও হইবে নীতও হইবে, নিয়ন্তাও হইবে নিয়ন্ত্রিতও হইবে, সে জানিবে কখন কি করা চাই সমষ্টির জন্য, সবই তাহাকে সম্মান আনন্দ দিবে। একত্ববোধ ও সঙ্গতি দিব্যজীবনের বিধান ও লক্ষণ, inescapable law.

এই ভাবে শাস্ত্র মনোময় জগৎ হইতে বিজ্ঞানময় জগতে উন্নীত হইবে। অবিজ্ঞা অজ্ঞান হইতে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও বিশ্বজ্ঞানে উঠিবে। উত্তরণ অবশ্যম্ভাবী, কেন না সেই উন্নততর স্বভাব, super-nature, তাহারই আপন স্বভাব, যদিচ তাহার বর্তমান চেতনার অগোচর। অজ্ঞানে অবস্থিত থাকিয়া আমরা যে জীবনধারা প্রবর্তিত করিতে পারি, তাহাতে জীবনের পূর্ণতা আসিতে পারে না। যাহা

গড়িয়া তুলি তাহাতে ভাল, সুন্দর যে একেবারে নাই
 তাহা নহে, কিন্তু বেশী রহিয়াছে মন্দ ও অসুন্দর।
 গুরুবরের ভাষায়, a constructive half
 rightness mixed with much that is
 wrong and unlovely and unhappy. ফলে
 আমাদের গঠিত সংস্থানগুলি ও তাহাদের কার্যধারা
 স্থায়ী হয় না, কিছুকাল কাজ করিয়া ধ্বংসপথে যায়।
 Imperfect, we cannot construct perfection
 —আমরা নিজেরা অপূর্ণ, পূর্ণ জিনিস গড়িব কেমন
 করিয়া! সংঘটনগুলি বাহিরে কার্যকরী দেখাইতে
 পারে, কিন্তু টিকে না।

আমাদের প্রকৃতি, আমাদের চেতনা, একরূপ যে
 আমরা পরস্পরকে চিনি না, জানি না, আমরা পরস্পর
 বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন—rooted in divided ego, নানা
 সমষ্টির মধ্যে আংশিক সঙ্গতি হয়ত আমরা আনিতে
 পারি, একটা সামাজিক সংহতিও সাধিত করি, কিন্তু
 মোটের উপর আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ক্রমাগত
 বিকৃত হইয়া যায় পূর্ণ দরদের অভাবে, পূর্ণ বোঝা-

ভাগবত-জীবন

২১

পড়ার অভাবে, ভুল বোঝার দরুণ, অসন্তোষের দরুণ, বিরোধবিবাদের দরুণ—by imperfect sympathy imperfect understanding, gross misunderstandings, strife, discord, unhappiness. এ ছাড়া আর কি হইবে যতক্ষণ না আত্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়, একত্বের অন্তর অস্তরে না আসে! আমরা যাহা গড়িয়া তুলি, তাহা জোড়াতালি-গোছের একতা—constructed unity—ব্যক্তি ও ব্যক্তিগত স্বার্থের সমবায়। আইনকানূনের চাপেই সে একতা বজায় থাকে। আত্মজ্ঞান ও অন্তরের একত্ববোধকে সহায় করিয়া আমাদের প্রকৃতিকে আপন সীমা অতিক্রম করিতেই হইবে, তবে না আমাদের জীবন হইবে সমঞ্জস ও সুন্দর! যদি তাহা না হয়, যদি আমাদের স্বভাব যাহা আছে তাহাই থাকে, তাহা হইলে জীবনের পূর্ণ পরিণতি অসম্ভব, স্থায়ী সুখও মানুষের অদৃষ্টে নাই। কোন রকমে জোড়াতালি দিয়া ইহলোকে ষেটুকু সুখ পাওয়া যায় তাহাই লইয়া

সম্পূর্ণ থাকিতে হইবে। যথার্থ সুখ ও পূর্ণ জীবন লাভ করিবার জন্য কোন উর্দ্ধতর লোকে আরোহণ অবধি অপেক্ষা করিতে হইবে। নতুবা কোন নিগুণ নিরঞ্জন সত্তার মধ্যে লীন হইয়া নিষ্ক্রিয় সুখশান্তির চেষ্টা দেখিতে হইবে। শ্রীঅরবিন্দ বার বার বলিয়াছেন যে জগতের অভিব্যক্তির পর্য্যবসান হয় নাই, নিশ্চয়ন জড় হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টির যে উর্দ্ধগতি চলিয়া আসিয়াছে তাহা বর্তমান অপূর্ণসত্তা মানব পর্য্যন্ত আসিয়া থামিয়া যাইবে কেন? সুষুপ্ত স্বতচিত্ত জাগ্রত হইবেই, it is our spiritual destiny to manifest and become that super-nature—for it is the nature of our true self, our still occult, because unevolved whole being—ইহাই মানবের নিয়তি; মানবের যথার্থ পূর্ণ সত্তার যে প্রকৃতি, সেই পরা-প্রকৃতিকে মানবের উপলব্ধি করিতেই হইবে। আমাদের চাই পূর্ণ চেতনাতে জাগ্রত আধ্যাত্মিক

ভাগবত-জীবন

২৩

জীবন। এই জাগরণের অবশ্যস্তাবী ফল আত্মজ্ঞান, পূর্ণ পরিণত জীবন, চিরন্তন সুখ ও পরম আনন্দ। ক্রমবিবর্তনের পথে এই জাগরণও আসিতে বাধ্য।

মনোময় জীবের মধ্যে তাহার কল্পিত জ্ঞানের সহিত যথার্থ সত্য বা পূর্ণ সত্যের বিরোধ সর্বদাই রহিয়াছে। দিব্যচেতনার স্বভাব এই যে তাহার দৃষ্টি ও কার্য আংশিক হয় না, there is a wholeness of sight and action. সেই জন্য তাহার জ্ঞান ও সংকল্প একত্রে এক অভিন্ন শক্তিরূপে কাজ করে এবং পরম সত্যের সহিত তাহার পূর্ণ যোগ থাকে। আমাদের মানসিক ভেদজ্ঞান সসীমতা ও অপূর্ণতার দরুন যতটুকু সত্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারি তাহাও পুরাপুরি কাজে লাগাইতে পারি না। ফলে আমাদের প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যায়, অনেক সময়ে শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়িয়া বসি। একটা কোন কল্পনা মনে জাগিলেও

তাহাকে কার্যে পরিণত করিতে পারি না। ফলে উৎসাহ ভঙ্গ ও আবার নূতন করিয়া আরম্ভ, ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা। আমরা বাহ্য দেখি, বাহ্য বুঝি, তাহার সহিত চরম সত্যের সঙ্গতি নাই, তাই বাহ্য কিছু গড়িতে বাই তাহাই পণ্ড হয়। এই যে মানবের মনের মধ্যে বিরোধ, ইহা কেবল জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের নয়, ইচ্ছার সহিত ইচ্ছার; ইচ্ছার সহিত জ্ঞানের বিরোধও পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। কখনও যথেষ্ট জ্ঞান সত্ত্বেও ইচ্ছার অভাব হয়, কখনও প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও জ্ঞানের অভাব ঘটে। আমাদের জীবনে ও কার্য-ধারাতে জ্ঞান সংকল্প সামর্থ্য ও ব্যবহারের নানা প্রকারের অসামঞ্জস্য, অসঙ্গতি ও অপূর্ণতা ক্রমাগত উপস্থিত। ফলে সকল কর্ম-প্রচেষ্টাতেই অল্পবিস্তর ব্যর্থতা আসিয়া পড়ে।

All kinds of disparity and maladjustment and incompleteness of our knowledge, will, capacity, executive force

and dealing intervene constantly in our action, our working out of life and are an abundant source of imperfection or ineffectivity.

এই যে অপূর্ণতা অক্ষমতা ইত্যাদি, ইহা অজ্ঞানের চির সহচর। উদ্ধৃত জ্যোতির সাধ্য না মিলিলে ইহার প্রতিবিধান অসম্ভব। মানবমন বিজ্ঞানের আলোকে যেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, তেমনই সে অভিন্নতা সঙ্গতি ইত্যাদি দিব্যগুণসমূহ উপলব্ধি করিতে থাকিবে, অক্ষমতা ও ব্যর্থতার কারণগুলি কমিতে থাকিবে, ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে আরম্ভ করিবে, জ্ঞানের শক্তি ও সংকল্পের শক্তি বাড়িয়া চলিবে। বিজ্ঞানময় জীবনে জ্ঞান ও সংকল্প উভয়ই প্রসার লাভ করিবে, হৃদয়ের শক্তিতে শক্তিমান হইবে। গুরুবরের ভাষায়, will reach a greater magnitude—a higher degree of themselves, a richer instrumentation. চেতনার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে শক্তি-সামর্থ্যও বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য।

বিজ্ঞানময় জীবে জ্ঞান ও শক্তি সুসমঞ্জস হইবে। সাধারণ মানবে যে এই সামঞ্জস্য দেখা যায় না, ইহার কারণ তাহার চেতনা নিজ্ঞানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন এবং তাহার শক্তি অজ্ঞান আবরণের দ্বারা ব্যাহত। জগতে নিশ্চেতন জড়শক্তিই প্রধান শক্তি, সচেতন মন তাহার তুলনার অতি ক্ষুদ্র ব্যাপার। ব্যক্তিগত মনের গতিবিধি নিতান্তই সীমাবদ্ধ, কিন্তু নিশ্চেতন বলিলে বুঝায় প্রচ্ছন্ন বিশ্বব্যাপী চেতনার বিরাট ক্রিয়া—The inconscient is an immense action of a universal concealed consciousness. চারিদিকে প্রচণ্ড জড়শক্তির খেলা দেখিতে দেখিতে আমরা ভুলিয়া যাই যে তাহার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বিশ্বপ্রাণ বিশ্বমন এবং সুপ্ত অতিমানস।

প্রাণশক্তির সামর্থ্য মনের অপেক্ষা বেশী কেন না যদিচ কল্পনা-ধারণার রাজ্যে মনই প্রধান, তথাপি সে কার্য্য করিতে পারে না জড় ও প্রাণশক্তির সাহায্য

ভাগবত-জীবন

২৭

বিনা। তবু আমরা দেখিতে পাই যে প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাব জন্তুদের মধ্যে বাহ্য, তাহা অপেক্ষা মানুষে বেশী। ইহার কারণ তাহার চেতনা ও জ্ঞানের অধিক শক্তি, ইচ্ছার অধিক শক্তি। প্রাণময় (vital) মানব ও মনোময় (mental) মানবের তুলনা করিয়া গুরুবর বলিতেছেন যে প্রাণময়ের সক্রিয়তা বেশী। চিন্তার ব্যাপারে বুদ্ধিজীবীর সামর্থ্য বেশী হইলেও জীবনের উপর প্রভাব প্রাণময়ের অধিক। তবে ক্রমশঃ মনোবুদ্ধির বলে মনোময় মানব এমন উন্নত অবস্থায় পৌঁছিতে পারে যেখানে শুধু প্রাণশক্তি কিংবা প্রাণীর সহজবুদ্ধি (life instinct) পৌঁছিতে পারিবে না। চেতনা আরও অগ্রসর হইলে, মনের বাধাসমূহ অপসারিত হইলে, জড় প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাব আরও অনেক বাড়িবে।

তবে মানবমন প্রাণশক্তি ও জড়পদার্থের মুখাপেক্ষী থাকার দরুন তাহার শক্তি সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য, যদিচ সে সীমা অলজ্ঞ নয়। আধ্যাত্মিক ব্যাপারের আলোচনা

হইতে আমরা জানিতে পারি যে মনের উপর প্রাণের বা জড়ের প্রভাব প্রকৃতির চিরন্তন বিধান নয়। মানবের মন, ততোধিক তাহার আত্মা, নানা উপায়ে নানাদিকে জড়শক্তিকে ও প্রাণশক্তিকে আপন আয়ত্তাধীন করিতে পারে। আধুনিক জড়বিজ্ঞানের সাহায্যেও যে পারে তাহা নিশ্চিত। দিব্যমানসের প্রতিষ্ঠা হইলে ত কথাই নাই। গুরুবর বলিতেছেন, For the greater knowledge of the Gnostic Being would not be in the main an outwardly acquired or learned knowledge, but the result of an evolution of consciousness and of the force of consciousness, a dynamisation of the being. অর্থাৎ বিজ্ঞানময় মানবের গভীরতর জ্ঞান আসিবে, বাহিরের বিদ্যাচর্চা হইতে নয়, আপন পূর্ণ পরিণত চেতনা ও সেই চেতনার শক্তি হইতে, তাহার সমগ্র সত্তার সক্রিয়তা হইতে। ফলে সে নিজের ও অপরের অন্তর সম্বন্ধে, প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক প্রচ্ছন্ন শক্তি-

ভাগবত-জীবন

২৯

সমূহ সম্বন্ধে, আপন মন-প্রাণ-দেহ সম্বন্ধে, সকল তত্ত্ব স্বতই জানিবে। এই জ্ঞানের, অন্তর্দৃষ্টির, ভিত্তি হইবে, বুদ্ধি নয়, বোধি। কেন না, বিজ্ঞানময় মানবের পূর্ণ যোগ থাকিবে সেই চিৎশক্তির সহিত, যাহা সৃষ্টির মূল। দিব্যজ্ঞানের জ্যোতিতে স্নাত মানব ক্রমশঃ হইবে আপনার নিয়ন্তা, চৈতন্য শক্তির নিয়ন্তা, জড়শক্তির নিয়ন্তা, আপন দেহপ্রাণরূপী যন্ত্রের নিয়ন্তা—more and more master of himself, master of the forces of consciousness, master of the energies of Nature, master of his instrumentation of life and matter. অবশ্য এ অভিব্যক্তি এক লাফে হইবে না। কিন্তু প্রত্যেক মধ্যবর্তী স্তরে উর্দ্ধতম লোকের জ্যোতির সংস্পর্শের ফল দেখা যাইবে।

দিব্যচেতনার অধিষ্ঠানের ফলে নব নব শক্তির আবির্ভাব হইবে! মন দেহ-প্রাণের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে, দেহ প্রাণের আয়ত্তে আসিবে, আত্মা দেহ-প্রাণ-মনকে আপন আয়ত্তাবীন করিবে। আত্মা

৩০

ভাগবত-জীবন

ও আত্মার মধ্যে, মন ও মনের মধ্যে, প্রাণ ও প্রাণের মধ্যে সীমা অপসারিত হইবে। ব্যক্তিগত চেতনা ও অপর সকলের চেতনা এক অভিন্ন হইয়া যাইবে। একত্বের সহিত সঙ্গতি আপনা হইতে আসিবে। একত্ব ও অভেদের বোধ হইতে পরস্পরের সম্বন্ধে একটা সহজ আন্তরিক জ্ঞান জন্মিবে। সকলেই সকলের অন্তর্ভূতি চিন্তাধারা কার্য্যধারা সম্পূর্ণরূপে জানিবে—মনের সহিত মনের, হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের, প্রাণের সহিত প্রাণের, পূর্ণযোগ ও পূর্ণ পরিচয় থাকিবে।

নবজীবনের স্বভাবই হইবে অভেদজ্ঞান—
conscious unanimism. সঙ্গতি আত্মার নিয়ম।
সঙ্গতির মূলে বহুর মধ্যে, বিচিত্র নামরূপের মধ্যে,
অনুস্থ্যত একত্বের অন্তর্ভূতি। বিচিত্রতা নহিলে
সঙ্গতির ত কোন অর্থ থাকে না! বৈচিত্র্য থাকিলে
হয় অসঙ্গতি নয় সঙ্গতি, হয় অসামঞ্জস্য নয়
সুসামঞ্জস্য। মনোময় জগতে ভেদ ও অসঙ্গতি,
বিজ্ঞানময় জগতে অভেদ ও সঙ্গতি।

ভাগবত-জীবন

৩১

চিন্তাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, উদ্ভবের পূর্বে জগতে যে সঙ্গতি ছিল তাহাকে শ্রীমদ্রবিন্দ instinctive বা সহজবুদ্ধিজাত বনিয়াছেন। আজিকার পৃথিবীতে ইহার উদাহরণ বল্লীক, মধুচক্র ইত্যাদি। উই বা মোমাছির নিত্য কর্মে যে নিপুণতা, শৃঙ্খলা ও সমবেত প্রচেষ্টার পরাকাষ্ঠা আমরা দেখি, তাহা অত্যাশ্চর্য্য হইলেও সহজবুদ্ধি বই কিছু নয়। প্রকৃতিবশে উই মোমাছি একত্র কাজ করে। মানবজীবনে তাহার জায়গায় আসিয়াছে বুদ্ধিবলে বোঝাপড়া, বাকশক্তির সাহায্যে মিটমাট। কিন্তু সে বোঝাপড়াকে ও যথার্থ সঙ্গতি বলা যায় না, কারণ তাহার মূলে অভিন্নতাবোধ নাই। ভাগবত জীবনে আসিবে এক স্বতঃস্ফূর্ত আধ্যাত্মিক একত্বজ্ঞান। বিজ্ঞানময় জীব নূতন ইন্দ্রিয়, নূতন দেহযন্ত্রের, উদ্ভব ত করিবেই, উপরন্তু পুরাতন যন্ত্রগুলিরও সূক্ষ্মতর উপযোগ করিবে।

অতি-আধুনিক মন গৃঢ় প্রচ্ছন্ন চেতনা শক্তির জাগরণ মানে না। এরূপ অভিব্যক্তিকে বুজুকি বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায়। শ্রীঅরবিন্দ এ সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এখানে পুনরুল্লেখ নিম্নয়োজন। প্রচ্ছন্ন চেতনার অভিব্যক্তি কেন সম্ভবপর হইবে না? প্রাকৃতিক নিয়মে চেতনা শক্তি যতটা উদ্ভুদ্ধ হইয়াছে, মানুষ আপন চেষ্টা দ্বারা চেতনার ততোধিক অভিব্যক্তি কেন আনিতে পারিবে না, সেই পূর্ণ পরিণত চেতনা শক্তিকে কেন কাজে লাগাইতে পারিবে না? শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, It is a question of discovering and developing an instrumentation of powers of consciousness overpassing anything that Nature has herself organised. তাহা হওয়াতে অবিদ্বন্দ্বীয় অসম্ভব কিছু নাই। বাহ্য আমাদের প্রকৃতি তাহা পশুদের কাছে অতিপ্রাকৃত। তেমনি আজ মানবের কাছে বাহ্য অতিপ্রাকৃত,

ভাগবত-জীবন

৩৩

দেবমানবের পক্ষে দাঁড়াইবে তাহা স্বাভাবিক ।
 আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতাতেও ত এক আধ বার
 আমরা উদ্ধতর লোকের জ্যোতির দেখা পাই ।
 অতিমানবের অবতরণকে অধৌক্তিক, অসম্ভব,
 ভাবিবার যথাযোগ্য কারণ কিছু নাই । যদি নিশ্চেতন
 হইতে অবচেতনে, অবচেতন হইতে চেতনে আরোহণ
 সম্ভবপর হইয়া থাকে, ত চেতন হইতে প্রচেতনে
 আরোহণ না ঘটিবে কেন ! অভিব্যক্তি অকস্মাৎ
 অর্দ্ধপথে থামিবে কেন ?

আমাদের আজিকার মনোময় জীবনে দিব্য-
 জ্যোতির সংস্পর্শ মিলে কচিং কখনও, কিন্তু তাহাকে
 কেহ বড় একটা আমল দেয় না । Mystic সাধকের
 গূঢ় সাধনাতেও চেতনার নব নব শক্তির উন্মেষ দেখা
 যায় বটে কখন কখন । একাগ্র সাধনার ফলে
 অন্তরের দ্বার খুলিয়া গেলে অকস্মাৎ স্বতঃ সূক্ষ্মশক্তির
 অবতরণ ঘটে । কিন্তু অনেক সময়ে ইহাতে সাধককে
 বড় বিপদে পড়িতে হয় ; কেন না, সে তখনও সেইরূপ

শক্তি আবাহনের জ্ঞান প্রস্তুত নয়। আবার, যে সাধক মুক্তিকামী, ভগবৎ প্রেমে মগ্ন, সে এ শক্তিসমূহ চায় না—কেন না, তাহার ভয় যে অলৌকিক শক্তি তাহার আসল কাঞ্চে ব্যাঘাত ঘটাইবে। তেমনই যেখানে সাধক কাঁচা, তাহার পক্ষেও দৈবশক্তির অকস্মাৎ অবতরণ বিপদজনক—কেন না, ইহার ফলে তাহার অহমিকা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

কিন্তু যেখানে উচ্চতর সূক্ষ্মতর চেতনার জাগরণের ফলে দৈবশক্তি স্বতঃস্ফূর্ত হইয়াছে, সেখানে বিচলিত হইবার কিছু নাই, কেন না ইহা অন্তঃপুরুষেরই অভিপ্রেত, তাঁহারই প্রকট হইবার লক্ষণ মাত্র। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, Such a growth is part of the very aim of the Spiritual being within us. উচ্চতর শক্তি না নামিলে উচ্চতর চেতনাতে আরোহণের অর্থই হয় না, আরোহণ অসম্পূর্ণ থাকে। সাধারণ মানব যেরূপ তাহার মানসিক শক্তির উপযোগ করে, দেবমানব সেইরূপ

ভাগবত-জীবন

৩৫

স্বল্প অতিমানস শক্তির উপযোগ করিবে। ভবিষ্যৎ
 অভিব্যক্তিতে অর্থোক্তিক অবিশ্বসনীয় অস্বাভাবিক
 অতিপ্রাকৃত কিছুই ঘটিবে না। জড় হইতে উদ্ভিদ,
 উদ্ভিদ হইতে বুদ্ধিহীন জীব, বুদ্ধিহীন জীব হইতে
 বুদ্ধিজীবী মানব, যেমন অভিব্যক্তির পথে একে একে
 আবির্ভূত হইয়াছে, তেমনই বুদ্ধিজীবী মনোময়
 মানবের একদিন পরিণতি হইবে প্রচেনন প্রবুদ্ধ
 দেবমানবে। দিব্য চেতনার শক্তিসমূহ দিব্য জীবনের
 প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্যসম্ভাবী, indispensable to a
 greater or more perfect life.

সাধারণ মানব-জীবনে যে সঙ্গতি সাধিত হইতে
 পারে, তাহা আংশিক ও অপূর্ণ। কেন না, সে
 সঙ্গতি আনিবার জন্য জনসাধারণের কাহাকেও মিষ্ট
 কথায় ভুলাইতে হয়, কাহাকেও বোকা বুঝাইতে হয়,

আবার কাহাকেও বা জোর জবরদস্তি করিতে হয়।
 বুদ্ধিমান্ যাঁহারা, বলবান্ যাঁহারা, তাঁহারা একটা
 মনগড়া ব্যবস্থা করিয়া তাহা সমাজ বা রাষ্ট্রের স্বন্ধে
 চাপাইয়া দেন। ফলে একটা জোড়াতালিমত সদ্গতি
 আসে বটে, কাজ চলিয়া যায়। কিন্তু সাধারণের
 মনে সেই ব্যবস্থা বা সমবেত লক্ষ্য সম্বন্ধে একটা
 পরিষ্কার ধারণা থাকে না। প্রবলের দ্বারা চালিত
 হইয়া তাহারা অন্ধভাবে যে কার্যধারা বা ব্যবস্থা
 মানিয়া লয়, তাহার অর্থ তাহারা সম্যক বোঝে না।
 তাই বিরোধের সম্ভাবনা সর্বদাই থাকে! আর
 থাকে, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, a mass of
 repressed or unfulfilled desires and
 frustrated wills, a simmering suppressed
 unsatisfaction or an awakened or eruptive
 discontent—রাশি রাশি অপূর্ণ বাসনা, ব্যাহত
 ইচ্ছা, প্রচ্ছন্ন ধূমায়মান অতৃপ্তি বা জাগ্রত অসন্তোষ-
 বহি। এরূপ সমাজ বা রাষ্ট্র-প্রচেষ্টার মধ্যে ধ্বংসের
 বীজ সদাই নিহিত। নূতন চিন্তাধারা, নূতন লক্ষ্য

আসিলেই বিপ্লব মারামারি কাটাকাটি অনিবার্য।
 বাহ্যিক আপাত-প্রতীয়মান সামঞ্জস্য-সঙ্গতির সহিত
 ভিতরের উদ্দাম প্রাণশক্তির বা বাহিরের প্রতিকূল
 আবেষ্টনের সংঘর্ষ নিয়ত চলিয়াছে। আধ্যাত্মিক
 শক্তি, আত্মসংঘর্ষ, একাত্মবোধ এবং আবেষ্টনের উপর
 অব্যাহত প্রভাব ব্যতিরেকে স্থায়ী ও পূর্ণ সঙ্গতি
 সাধন কিরূপে সম্ভবে !

কিন্তু গলদ ত কেবল সমষ্টি ও সমাজ লইয়া নয় !
 প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই পরস্পর-বিরোধী শক্তিসমূহ
 অবিরাম যুদ্ধ করিতেছে। সেই শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত
 করিবার কোন সামর্থ্য ব্যক্তির নাই। আপনার
 উপর এরূপ প্রভাব মনোময়ের নাই। একমাত্র
 অন্তঃপুরুষ পারে দুর্দম শক্তিসমূহকে সংযত করিতে,
 কিন্তু সাধারণ মানবের ত অন্তঃপুরুষ স্তম্ভ ! মানবের

চেতনাতে যেমন একদিকে প্রেম, দয়া, দরদ ইত্যাদি স্বাভাবিক সদগুণাবলী রহিয়াছে, তেমনই অপর দিকে রহিয়াছে তাহার বুদ্ধিবৃত্তির দাবী, প্রাণশক্তির ঠেলাঠেলি, স্বার্থের আকর্ষণ। সমাধান কোথা হইতে হইবে! একমাত্র পন্থা সুষ্পষ্ট পুরুষের উদ্বোধন, সত্যের দিব্য জ্যোতিতে নিরন্তর বাস।

আমাদের অন্তরের পরম্পর-বিবাদী শক্তিগুলি সম্বন্ধে গুরুবর বলিতেছেন, In order to make them concordant and actively fruitful in the whole being and whole life, we have to grow into a more spiritual nature. We have to live in the light and force of a higher and larger and more integral consciousness of which knowledge and power, love and sympathy and play of life-will are all natural and ever-present accorded elements. অর্থাৎ এই শক্তিসমূহকে সুসমঞ্জস ও কার্য্যকরী করিতে হইলে আমাদের আধ্যাত্মিক সত্তাকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। উচ্চতর

বৃহত্তর চেতনার আলোকে ও শক্তিতে আমাদের বাস করিতে হইবে। তবে আমাদের জ্ঞান, শক্তি, প্রেম, দয়া, দরদ ইত্যাদি বৃত্তিগুলি সেই দিব্য জ্যোতিতে পরিপূর্ণ সঙ্গতি লাভ করিবে।

একটা কথা স্পষ্ট বোঝা চাই যে, মনোবুদ্ধির প্রয়োগ দ্বারা মানুষ কোনদিন তাহার অন্তরের বৃত্তিসমূহের বেখাপ্পা দাবীদাওয়া মিটাইতে পারিবে না। পারিবে শুধু যদি তাহার আত্মাপুরুষ জাগ্রত হয়। দিব্যমানবের দিব্যজীবন আত্মাপুরুষের এই জাগরণ-সাপেক্ষ। প্রজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ মানবের ভেদবোধ থাকিবে না, তাহার স্বাভাবিক অবস্থা হইবে একত্ব-বোধ, সঙ্গত চেতনা ও সঙ্গত ক্রিয়া। এইভাবে ব্যক্তিগত জাগৃতি আসিলে প্রবুদ্ধ মানবের সমষ্টির মধ্যেও সঙ্গতিবোধ আসিতে বাধ্য। অবশ্য হয়ত

এরূপ সমষ্টি বা সমাজের বাহিরে এমন সব মানুষ থাকিবে যাহারা তখনও অন্ধতা জড়তা পরিহার করিতে পারে নাই। অভিব্যক্তির পথে তাহারা পিছাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এরূপ অবস্থা বেশী দিন টিকিতে পারে না।

পুরাকালে জগতে যখন বুদ্ধিজীবী পূর্ণপরিণত মানবের উদ্ভব হইয়াছিল, তখনও অপরিণত অর্দ্ধমানব বিস্তর ছিল। কিন্তু নব-আবির্ভূত যৌশক্তিসম্পন্ন অরিনাসী মানবের সম্মুখে অর্দ্ধপরিণত নিয়েণ্ডারটাল নর টিকিল কই! সব মরিয়া গেল কি না, কিরূপে গেল, তাহা আজও জানা যায় নাই। দুই জাতির মনুষ্যের মধ্যে যে ভীষণ রক্তাক্ত যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়াছিল, তাহারও কোন প্রমাণ ভূগর্ভে পাওয়া যায় নাই। তেমন কিছু ঘটিলে নিশ্চয়ই ভূগর্ভে একস্থানে বহু নরপঙ্গর এবং বহু আদিম অস্ত্রশস্ত্রাদি পাওয়া যাইত। যাই হোক, নিয়েণ্ডারটাল জগতে একটীও রহিল না। ভবিষ্যতের বিজ্ঞানময় মানব কাটাকাটি করিবে না,

কেন না কাটাকাটি তাহার স্বভাববিরুদ্ধ । মনোময়
মানবকে সে ছঃসহ মেরুপ্রদেশে কি দুর্গম মরুভূমিতে
বিতাড়িত করিবে না । মনোময় মানবের মুখের গ্রাস
সে কাড়িয়া থাইবে না । কিন্তু দেবমানবের আবির্ভাবের
পরে বুদ্ধিজীবী মানব যে ধীরে ধীরে লোপ পাইবে
তাহাও সুনিশ্চিত । গুরুদেব বলিতেছেন, দিব্য নব-
মানবকে পৃথিবীর সাধারণ জীবনধারার মধ্যে নিজেকে
খাপ খাওয়াইতে হইবে এবং যতদূর সম্ভব সেই ধারার
মধ্যে একত্ববোধ ও সঙ্গতিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে ।
তবে বিজ্ঞানময় জীব ও অজ্ঞানময় জীবের মধ্যে
একত্ববোধ, পরস্পরের সম্বন্ধে অন্তরঙ্গ জ্ঞান থাকিতে
পারে কি ? শ্রীঅরবিন্দ আশ্বাস দিতেছেন যে
ব্যাপারটী যত কঠিন মনে হইতেছে তত কঠিন কিছু
সত্যই নয়, কারণ the gnostic knowledge
would carry in it a perfect understanding
of the consciousness of the ignorance—
প্রবুদ্ধ মানব অজ্ঞানের চেতনাকেও স্বতই পূর্ণভাবে

বুঝিবে। মনোময় মানব দিব্য আলোককে প্রথম প্রথম হয়ত চিনিবে না, প্রত্যাখ্যান করিবে, কিন্তু দিব্য জ্যোতি ও ঋতচিৎকে কত দিন ঠেকাইয়া রাখিবে! অবশেষে অভেদ ও সঙ্গতির প্রতীক নব-মানবের চরণে তাহাকে নত হইতেই হইবে। অন্ধকার কি আলোকের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশীদিন করিতে পারে!

এই যদি আমাদের পরিণতির চরম লক্ষ্য হয় তাহা আমাদের বর্তমান অবস্থার স্বরূপ কি, তাহা বোঝা একান্ত আবশ্যক। এ পর্য্যন্ত আমাদের অভিব্যক্তি অগ্রসর হইয়াছে অতি আঁকাবাঁকা পথে মন্তর-গতিতে। অদূর ভবিষ্যতে সোজা পথ ধরিবার কতদূর সম্ভাবনা আছে, তাহা ভাবিবার কথা। আমাদের মনোমধ্যে নানা বিরোধী ভাবনা-চিন্তার

সমাবেশ হইয়া থাকিলেও বেশ বোঝা যায় যে, আমাদের অন্তরের একটা আত্মহা আছে জীবনের পূর্ণতার দিকে, একটা অস্পষ্ট বোধ লুক্কায়িত আছে অথও একতার ।

কিন্তু কিরূপ পূর্ণতা পরিণতি চাই আমাদের ! ব্যক্তিগত না সমষ্টিগত, না ব্যক্তির সহিত সমষ্টির পরস্পর সম্বন্ধগত ? এ বিষয়ে মতের বা লক্ষ্যের মিল দেখা যায় না । কেহ বলেন, ব্যক্তিগত স্বাভাব্যই প্রধান জিনিস । তিনি এমন সমাজ, এমন রাষ্ট্র চান, যেখানে ব্যক্তির চিন্তাক্ষেত্র, ব্যক্তির কর্মক্ষেত্র অব্যাহত, যেখানে তাহার আপন উন্নতি, আপন ব্যক্তিগত জীবনের সার্থকতাই হইবে চরম কাম্য । অপরে বলেন, সমষ্টিগত জীবনই আমাদের ধ্যেয়, সমগ্র মানব জাতির কল্যাণই আমাদের কাম্য বস্তু,

ব্যক্তিগত স্বার্থ সমগ্র জাতির স্বার্থের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার। জীবদেহে এক একটা কোষ যেমন, সমুদয় জাতিতে এক একটা ব্যক্তি তেমনই। জীবের প্রাণই মুখ্য, কোষের প্রাণ নয়। আবার একথাও শোনা যায় যে এক একটা সমাজ বা রাষ্ট্র এক একটা স্বতন্ত্র সত্তা, তাহার নিজস্ব প্রাণ আছে, শক্তি আছে, সংস্কৃতি আছে, ধর্ম আছে, সার্থকতা আছে—এই সমষ্টিগত প্রাণ ও ধর্মের কাছে ব্যক্তির জীবন কিছুই নয়। আবার এরূপ মতও শোনা যায় যে, মানুষের জীবন ত সমাজের জন্ত, অপরের জন্ত— তাহার উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ভর করিতেছে, সে সমষ্টির স্বার্থে আপন ব্যক্তিগত স্বার্থ কতটা নিমজ্জিত করিয়াছে তাহার উপর। ইহারা এরূপও বলেন যে, ব্যক্তি যেমন সমাজের জন্ত, সমাজও তেমনই মানব জাতির জন্ত। অর্থাৎ সমগ্র জাতির শিক্ষা-দীক্ষা, তাহার ভাত-কাপড়, তাহার বাসগৃহ, তাহার ঔষধোপচার, ইহারই জন্ত মানবের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র।

ভাগবত-জীবন

৪৫

প্রাচীনদের চক্ষে প্রথমে সমাজের অভিব্যক্তিই ছিল মুখ্য বস্তু, কিন্তু ক্রমশঃ ব্যক্তিগত উৎকর্ষ এবং পরিণতিও তাঁহাদের নজরে প্রয়োজনীয় ব্যাপার বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। ভারতের কল্পনা ছিল অন্তরূপ। ঋষিগণ ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তিকেই বড় বলিয়া জানিতেন; কিন্তু তাঁহারা ইহাও বুঝিতেন যে, ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক পূর্ণ পরিণতি দিতে হইলে যে সমাজের মধ্য হইতে তাহাকে উঠিতে হইবে সেই সমাজও সুগঠিত সুসমঞ্জস পূর্ণ পরিণত হওয়া চাই।

বর্তমান জগতের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে জাতীয় জীবন, সুগঠিত নিখুঁত সমাজ এবং সমগ্র মানব জাতির জীবনধারাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সংঘটন। শ্রীমদ্রবিন্দেবের ভাষায়, the life of the race, a perfect society and latterly to a concentration on the right organisation and scientific mechanisation of the life

of mankind as a whole. ব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইতেছে তাহা হইলে সমষ্টির উপকরণ বা unit মাত্র। মানুষ একটা স্বতন্ত্র মানসিক বা আধ্যাত্মিক জীব, যাহার আপন সত্তার অধিকার বা শক্তি আছে, ইহা আর কেহ বড় একটা মানিতে চাহিতেছে না।

ব্যক্তি এখন এই ভীষণ দোটানার মধ্যে পড়িয়াছে। প্রকৃতি তাহাকে তাহার নিজের জন্ত বাঁচিতে বলিতেছে, আপন স্বতন্ত্র সত্তা সার্থক করিতে বলিতেছে। সমাজ তাহাকে বলিতেছে সমষ্টির জন্ত, সমগ্র মানব জাতির জন্ত বাঁচিতে, শুদ্ধ সমষ্টির স্বার্থ সাধনের জন্ত কাজ করিতে। রাষ্ট্র দাবী করিতেছে তাহার আনুগত্য আত্মদান স্বার্থত্যাগ। তাহার অন্তর চাহিতেছে আপন ব্যক্তিগত লক্ষ্য অনুসরণ করিতে, আপন মতানুসারে চলিতে, আপন স্বাধীন বিবেকের নিকট হইতে সর্ববিষয়ে আদেশ লইতে। এই যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে, কল্পনাতে কল্পনাতে, ভাবনাতে ভাবনাতে বিরোধ—ইহা অজ্ঞানের ফল। সঙ্গতি আসিতেছে

না একত্ববোধের অভাবে, চরম সত্যের উপলব্ধি নাই বলিয়া। সমস্তার সমাধান হইতে পারে শুধু চরম জ্ঞানের দ্বারা, একত্ব ও সঙ্গতির অনুভূতির দ্বারা। এই দিব্যজ্ঞানের মূল আমাদেরই মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করাই আমাদের কাজ।

There is a Reality, a truth of all existence which is greater and more abiding than all its formations and manifestations. বিচিত্র নামরূপের পশ্চাতে যে অখণ্ড অনন্ত সত্য নিহিত আছে সেই সত্যের সন্ধান পাইলে তবে মানুষ পূর্ণতম অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, সমগ্র মানব জাতি, ইহার প্রত্যেকটাই সেই সত্যের প্রকাশ। তবে এ কথা উপলব্ধি করা চাই যে, চরম সত্য সমগ্র মানব জাতিকে, মানবত্বকেও, অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। মনোময় মানবের আবির্ভাবের পূর্বেও বিশ্ব ছিল,

আবার মনোময় মানব যখন বুদ্ধানে জাগ্রত হইবে
তখনও বিশ্ব, তখনও সত্য, থাকিবে।

সেইরূপ ব্যক্তিগত মানবের একটা সত্তা ও
অভিব্যক্তি আছে যাহা সত্যের অনুসারী, যাহা তাহার
সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনে সীমাবদ্ধ নয়। গুরুবর
বলিতেছেন, although his mind and life are,
in a way, part of the communal mind
and life, there is something in him that
can go beyond them.....He is not a
mere cell of the collective existence.
অর্থাৎ যদিচ এক রকমে বলা যায় যে, ব্যক্তির মনপ্রাণ
সমষ্টির মনপ্রাণের অন্তর্গত, তথাপি ব্যক্তির মধ্যে
এমন কিছু আছে যাহা তাহার সমষ্টিকে অতিক্রম
করে—সে সমাজ দেহের কোষমাত্র নয়। তেমনিই,
ইহাও সত্য যে সমাজ-অর্থে সমগ্র মানবজাতি নয়,

বিশ্বও নয়। যে কোন ব্যক্তি সমাজ ছাড়িয়া সমগ্র জাতির মধ্যে বাস করিতে পারে, আবার জাতিকে ছাড়িয়া দিয়া একা বিশ্বে বাস করিতে পারে।

মোট কথা, সমাজ ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হইলেও সমাজকে, সামাজিক জীবন ও সামাজিক আদর্শকে অতিক্রম করিয়া ব্যক্তির আপন জীবন ও আদর্শ আছে। পর্বতে মরুভূমে এমন সব যাযাবর মানুষ আছে যাহাদের জীবন স্বার্থসর্বস্ব, যাহারা সমাজের, রাষ্ট্রের, ধার ধারে না। পর্বত কন্দরে, গভীর অরণ্যে তপস্শ্রাবত এমন সব মানুষ আছে যাহারা অপর মানুষের সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না।

তথাপি ব্যক্তিই ক্রমপরিণতির কেন্দ্র—The individual is the key of the evolutionary movement. কেন না, উচ্চতর চেতনা, সত্যের অনুভূতি, যাহা আসিবে তাহা ব্যক্তির মনে। সমষ্টির গতিবিধি প্রধানতঃ অবচেতন। ব্যক্তির মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশ পায়, সচেতন হয়। সমাজের মধ্যে

বাহারা সর্বাপেক্ষা অগ্রসর, তাহাদের চেতনারই ছাপ
পড়ে সমাজগত চেতনার উপর। সমষ্টির পরিণতি
সর্বদা অনুসরণ করে ব্যক্তিগত পরিণতিকে।
গুরুবরের ভাষায়, Its general mass con-
sciousness is always less evolved than
the consciousness of its most developed
individuals.

রাষ্ট্র বস্ত্রবিশেষ, সমাজ সমগ্র জীবনের একাংশ
মাত্র। ব্যক্তির চরম পূজা, চরম allegiance, তাই
এই দুইটির কাহারও প্রতি নয়, তাহার চরম বরণ্য
সেই সত্য, সেই আত্ম, সেই ব্রহ্ম, যাহা সবার মধ্যে
অনুস্থিত। তাই ব্যক্তির কর্তব্য নয়—রাষ্ট্র বা
সমাজের মধ্যে আপন স্বতন্ত্র সত্তাকে একেবারে
হারাইয়া ফেলা, তাহার যথার্থ কাজ—আত্মোপলব্ধি
এবং সেই উপলব্ধির আলোকে সমাজ, রাষ্ট্র ও সমগ্র
জাতির ক্রমোন্নতি সাধন। কিন্তু তাহার ক্ষমতা
নির্ভর করিতেছে তাহার আপন সত্তার অভিব্যক্তির
উপর। পূর্ণ পরিণতি তাহাকে দিবে আধ্যাত্মিক

স্বাতন্ত্র্য। এই স্বাতন্ত্র্য মানে isolation বা একক অস্তিত্ব নয়। আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হওয়া মানেই আধ্যাত্মিক একত্বের দিকে অগ্রসর হওয়া।

এই ভাবে জাগ্রত বিবেকানন্দ সর্বভূতে ভগবানকে দেখিয়া আর্ন্ত ও দুঃস্থের ডাক শুনিয়াছিলেন। বুদ্ধ নির্বাণের দ্বারে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মোহমুগ্ধ দুঃখপীড়িত মানবকে ডাক দিয়াছিলেন।

For the awakened individual the realisation of his truth of being and his inner liberation and perfection must be his primary seeking.

প্রবুদ্ধ মানবের প্রথম সন্ধান হইবে সত্যের উপলব্ধি, অন্তরের পূর্ণতা ও আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্য। ব্যক্তির পূর্ণপরিণতি না হইলে সমাজের পূর্ণতা আসিতে পারে না। যেমন যথার্থ স্বাধীনতা মানে অন্তরঙ্গ আত্মার মুক্তি ও চরম সত্যের উপলব্ধি তেমনই পূর্ণতা মানে

৫২

ভাগবত-জীবন

আমাদের সকল চিন্তা ও সকল কার্যের মধ্যে
আধ্যাত্মিক সত্যের প্রতিষ্ঠা।

আমাদের স্বরূপ জটিল ও আপাত-অসমঞ্জস।
এই অসঙ্গতির মধ্যে সঙ্গতির একটা সরল পস্থা বাহির
করা আমাদের মুখ্য কাজ। জড়জীবনই ক্রমোত্তরণের
ভিত্তি। প্রকৃতি ক্রমবিকাশ আরম্ভ করিয়াছিলেন
সেইখান হইতে। মানুষকেও আরম্ভ করিতে হইবে
সেইখানে। কিন্তু বাত্রা আরম্ভ মাত্র। থামিলে
চলিবে না, থামিলে ত মানুষের আপন অভিব্যক্তি রুদ্ধ
হইত। তাহাকে প্রথম চিনিতে হইবে নিজেকে জড়
আবেষ্টনে অবস্থিত মনোময় জীব বলিয়া, ব্যক্তিগত ও
সমষ্টিগত ভাবে।

প্রাচীন ইউরোপে গ্রীসীয় জাতি এই পন্থাই
ধরিয়াছিল। রোমক যুগে গ্রাসীয় সংস্কৃতি ধারা

ভাগবত-জীবন

৫৩

কতকটা অল্প পথে গেল, রোমকেরা সংহতি শক্তিকে, সংঘটনকে, বড় করিয়া দেখিতে লাগিল। এই গ্রীসীয়-রোমক সাধনারই ক্রমিক পরিণতি আধুনিক যুগে দাঁড়াইল যুক্তিবাদ, কেবল বুদ্ধির দ্বারা জীবনের নিয়মন, জড়বিজ্ঞানকে সাধনা মন্দিরে শ্রেষ্ঠ আসন দান।

আমাদের পূর্বজন্মের প্রেরণা ছিল সত্য শিব ও সুন্দর। এই প্রেরণার আলোকে তাঁহারা আপন দেহ-প্রাণ-মনকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সাধনা এখানেই থামে নাই; কেন না অতি সত্ত্বর তাঁহাদের মনে জাগিয়াছিল একটা আধ্যাত্মিক আত্মপূহা। তাঁহারা চরম সত্যের জ্যোতিতে সারা বিশ্বকে এক অখণ্ড অনন্ত সত্তা বলিয়া দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই জ্যোতিই হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টীয় প্রভৃতি আশিয়া মহাদেশের সম্প্রদায়সমূহ জগৎমন বিকীর্ণ করিয়াছিল। কিন্তু সে দিব্য ভাতি পরবর্তী বর্ষের যুগের মারামারি কাটাকাটির মধ্যে নিভিয়া

গেল। অরাজকতার অবসানে এক নবীন কৃত্রিম আলোকে সভ্যজগৎ উদ্ভাসিত হইল, সত্য-শিব-সুন্দরের বেদীর উপর অধিষ্ঠিত হইল বুদ্ধিবাদ ও জড়বিজ্ঞান। নূতন সংস্কৃতির লক্ষ্য হইল অর্থনীতির ভিত্তির উপর পূর্ণপরিণত জীবন গঠন—সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান, শান্তিরক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, শিল্পচর্চা, বিদ্যাহুশীলন, মানসিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন। পরন্তু সবেমই মূলে বুদ্ধি-উপলব্ধ নীতিজ্ঞান, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সহিত তাহার কোন সম্পর্ক রহিল না। আমাদের প্রাচীনেরা যে ঐহিক ও পারত্রিকের সামঞ্জস্য দেখিয়া-ছিলেন, তাহা লোপ পাইতে বসিল। ইহার অনিবার্য পরিণাম বাহা, তাহা বটিল—বিশৃঙ্খলা অন্তরে ও বাহিরে, ব্যপ্তিতে ও সমপ্তিতে। গুরুবর বলিতেছেন, all received values were overthrown and all firm ground seemed to disappear—নবীন সংস্কৃতির ভিত্তি হইল চোরা বালি। এই বিরাট গণ্ডগোলের মাঝে আজ আমরা দাঁড়াইয়া আছি।

ভাগবত-জীবন

৫৫

মানব পরিণতবুদ্ধি, জড়বিচার কল্যাণে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ তাহার দাসীবাঁদী, অথচ আধ্যাত্মিক প্রেরণার একান্ত অভাব, এ অবস্থাকে আদিম বর্ষরতাতে প্রত্যাগমন বলিলে দোষ হয় না। একরূপ সমাজ বা রাষ্ট্র অতি সহজেই হীন স্বার্থসাধনের যন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়, মানবের অন্তরস্থ সুপ্ত রাক্ষস ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠে। ইতিহাসে আমরা বহুবার দেখিয়াছি যে, অতি সভ্য কিন্তু প্রাচীন, জরাগ্রস্ত জাতি নবীন শক্তিশালী বর্ষরের আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। এবার কিন্তু বোমা-বিমান সংরক্ষিত সভ্যতার কোন লোকসান বর্ষরে করিতে পারিবে না, তবে আমাদেরই অন্তরের বর্ষরকুল সভ্যতার মুখোস পরিয়া আমাদের ধ্বংস সাধনের জন্ত কোমর বাঁধিয়াছে। গুরুবর বলিতেছেন, That is bound to come if there is no high and strenuous mental and moral ideal liberating him from himself into his inner being. অর্থাৎ মানুষ যদি উচ্চতর মানসিক ও নৈতিক প্রেরণাবশে আপন অন্তরতম

সত্তার সংস্পর্শ লাভ না করে ত তাহার এই গতি অবশ্যস্বাবী। কেবলমাত্র তীক্ষ্ণবুদ্ধি একটা জাতিকে দীর্ঘকাল বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না। যদি তাহার অন্তর পরমসত্যের দীপ্তিতে দীপ্তিমান হইয়া থাকে, তবেই সে অভিব্যক্তির পথে বাঁচিয়া থাকিবে, নহিলে নয়। প্রকৃতির অগ্রগতি অব্যাহত থাকিবে। তাহা নিয়তির দ্বারা নির্দিষ্ট, কিন্তু দিব্য চেতনা হইতে বিচ্যুত মানব বহু প্রাচীন প্রাণীসমূহের মত পথপার্শ্বে পড়িয়া থাকিবে, as an evolutionary failure. যে জীব প্রকৃতির অগ্রগতির সহিত তাল রাখিতে পারিল না, তাহার আর স্থান কোথায় হইবে! বড় জোর, সে একটা সামান্য নগণ্য প্রাণীরূপে নবীন জগতের আনাচে কানাচে ঘুরিয়া বেড়াইবে। যেমন সেকালের Dinosaur প্রভৃতি অতিকায় গোধাকুল বিবর্তমান প্রকৃতির সহিত তাল রাখিতে না পারিয়া বাঁচিয়া রহিল ক্ষুদ্র টিকটিকি গিরগিটি রূপে। মানবের ক্রম-পরিণতির পথে একটা সঙ্কট সময় আসিয়াছে। একদিকে সে বহুদূর অগ্রসর

ভাগবত-জীবন

৫৭

হইয়াছে, কিন্তু অপর দিকে তাহার বাড় থামিয়া গিয়াছে। এই বাড় থামিয়া যাওয়া, overspecialisation, অতিবৈশেষ্য, ক্রম-পরিণতিতে অতি নারাত্মক রোগ। প্রকৃতির অগ্রগতির সহিত এই রোগগ্রস্ত প্রাণী চলিবে কিরূপে! মানুষ আজ বিশাল জটিল সমাজ ও রাষ্ট্রসমূহ গড়িয়া তুলিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সসীম মনোবুদ্ধি, তাহার অপরিণত আধ্যাত্মিক সত্তা সেই বিরাট সংঘটনের সহিত তাল রাখিতে পারিতেছে না। তাহার সৃষ্ট সভ্যতা সংস্কৃতি তাহাকেই গ্রাস করিতে বসিয়াছে। মানবের সভ্যতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে a too dangerous servant of his blundering ego and its appetites, বোকা মনিবের অতিচতুর চাকর। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত নানাবিধ দাবী-দাওয়া মিটাইবার শক্তি মানুষের নাই। নিত্য নব নব অভাব সে সৃষ্টি করিতেছে ও সেই অভাব পুরাইবার জন্ত অহরহ হাঁকুপাকু করিতেছে। সমষ্টিগত স্বার্থ এবং সেই

স্বার্থের সিদ্ধি লইয়া সমষ্টিগুলির মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ
 দ্বন্দ্ব দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। আজ প্রাকৃত বিচার
 চর্চার ফলে মানুষের শক্তি বিলক্ষণ বাড়িয়াছে, সমগ্র
 মানব জাতির বাহ্যিক জীবনধারা ও এক ছাঁদের হইয়া
 বাইতেছে, কিন্তু অন্তরে সাম্য বা মৈত্রী নাই, একত্ব-
 বোধ ত দূরের কথা! প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক
 সম্প্রদায়, প্রত্যেক সমষ্টি, আপন মত, আপন চিন্তা-
 ধারা ও আপন সঙ্কীর্ণ স্বার্থ লইয়া মশগুল। সঙ্গতির
 আশা অদূরপর্যন্ত। গুরুবরের ভাবায়—All
 that is there is a chaos of clashing
 mental ideas, urges of individual and
 collective physical want...a rich fungus
 of political and social and economic
 nostrums...slogans and panaceas for
 which men are ready to kill and be
 killed, অর্থাৎ আছে শুধু পরস্পর-বিরোধী
 মনোভাব, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অভাব-অভিযোগের
 তাড়না, রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক ব্যাধির

ভাগবত-জীবন

৫৯

টোটকা ঔষধ, মুখে নানারূপ বাঁধা বুলি নানা বাঁধা
গং—বাহার জন্ত মানুষ প্রাণ দিতে ও প্রাণ লইতে
সদাই উন্মুখ ।

বড় বড় কথা যে মানুষে বলে না, তাহা নহে ।
কিন্তু যে ভাবের কথা শোনা যায় তাহা ভেদ ও
অজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত মনের কল্পনা মাত্র, তাহার দ্বারা
সমস্তার বথার্থ সমাধান কখনই সম্ভবপর নয় । অতীত
কালে মানব তাহার জীবনে আংশিক সামঞ্জস্য
সাধিয়াছে খণ্ড খণ্ড সংঘটন দ্বারা, by ideation
and limitation, এবং সেই প্রচেষ্টার ফলে সে নানা
লক্ষ্য, নানা ভাবনা, নানা কর্মধারা প্রবর্তিত
করিয়াছে । কিন্তু এই সকল বিভিন্ন ধারার মধ্যে
যে বিরোধ ও সংঘর্ষ, তাহার অবসান হইতে পারে
না ; সমস্ত খণ্ডধারা মিলিয়া এক বিশাল স্রোতস্বতী

সৃষ্টি করিতে পারে না, যতদিন না মানব তাহার অন্তরে উচ্চতম চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়। বুদ্ধিবাদ ও জড়বিজ্ঞান একাজ করিতে পারিবে না। গুরুবরের ভাষায়, Reason and Science can only help by standardising. * * A greater whole being, whole knowledge, whole-power is needed to weld all into a greater unity of whole life. বুদ্ধিবাদ ও জড়বিজ্ঞান পারে শুধু বাহির হইতে মানুষকে এক হাঁচে ঢালাই করিতে। সমগ্র সত্তা, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্রশক্তির প্রয়োজন যথার্থ একত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু এই সমগ্রের অনুভূতি আসিবে কোথা হইতে? মহত্তর গভীরতর সত্যের উপলব্ধিই শুধু দিতে পারে সেই অনুভূতি, সেই সঙ্গতি। সে উপলব্ধি আসিলেই অপূর্ণ মানবমনের অপূর্ণ জোড়াতালির কাজ শেষ হইবে—ঐব সত্যের ভিত্তির উপর সর্ব্বথা পরিপূর্ণ হইবে মানবের জীবন। আজ মানুষ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে কিরূপ জীবন-মরণ সঙ্কট তাহার সম্মুখে

আসিয়াছে। উচ্চতর জীবনের পানে সে অন্ধভাবে তাহার হস্ত বাড়াইতেছে। মিটমাটের দ্বারা আজিকার ঘোর সমস্তার নিষ্পত্তি হইতে পারে না, কেন না সমস্তা মূলগত। প্রকৃতির অবশ্যস্তাবী বিবর্তনের বেগ সহ্য করিতে পারে, একরূপ মানবের আজ প্রয়োজন। সে মানবের একান্ত আবশ্যক বৃহত্তর প্রাণ ও বৃহত্তর মন, এবং সেই প্রাণ মনের পশ্চাতে জাগ্রত প্রবুদ্ধ আত্মাপুরুষ। শ্রীহরবিন্দের ভাষায়—A greater, wider, more conscious, unanimitised Life-Soul.

আমাদের যুক্তিবাদী মন সমস্তা সমাধানের যে পন্থা নির্দেশ করিতেছে, তাহা মোটামুটি গণতন্ত্র ও উদার অর্থনীতিক ভিত্তির উপর গঠিত মানবসমাজ। কিন্তু এই পন্থার অনুসরণ করিয়া মানুষ কি প্রাকৃতিক

অভিব্যক্তির দাবী মিটাইতে পারিবে, প্রকৃতি দেবী
 কি এইটুকু পাইয়া তুষ্ট থাকিবেন? শ্রীঅরবিন্দ
 বলিতেছেন যে মানবকে যদি বাঁচিতে হয় ত তাহাকে
 বিবর্তনের পথে আরও অনেকখানি অগ্রসর হইতে
 হইবে। মানুষের আপন মনেও এই সংশয় জাগিয়াছে
 যে জাতির ধ্বংসনিবারণ করিতে হইলে তাহাকে নূতন
 পথ ধরিতে হইবে, নূতন প্রেরণাতে নূতন করিয়া
 মানব সমাজ গড়িতে হইবে—যথার্থ ধ্যেয় কি, কাংক্ষ্য
 কি, তাহা নূতন করিয়া ধার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু
 আজ পর্য্যন্ত এদিকে মানবের কোন প্রচেষ্টা সফল হয়
 নাই; কেননা—the means adopted have been
 the forcible and successful materialisa-
 tion of a few restricted ideas and slogans
 to the exclusion of all thought. অর্থাৎ
 স্বাধীন চিন্তা বন্ধ করিয়া দিয়া মানুষকে বলপূর্ব্বক
 প্রবলের আদেশমত নির্দিষ্ট পথে চালিত করা হইয়াছে।
 ফলে ব্যক্তিগত স্বার্থকে সমষ্টির স্বার্থের সম্মুখে পূর্ণ-
 ভাবে বলি দেওয়া হইয়াছে, ব্যক্তিকে বলা হইয়াছে

—তোমার চিন্তা করার প্রয়োজন নাই; আমরা বিবেচনা করিয়া যাহা কিছু বলিব তোমরা তাহাই কলের মত করিয়া যাইবে। ইহাতে জগতের কিছু মঙ্গল হয় নাই। সমষ্টিগত স্বার্থ, সমষ্টিগত অহংকার, একরূপ বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে যে জগতে সুখশান্তি বলিয়া কোন পদার্থ আর থাকিতেছে না। সমষ্টির ইচ্ছা, সমষ্টির মঙ্গলামঙ্গল কি—তাহার নির্দেশ করিতেছেন দুই একজন শক্তিশালী পুরুষ, বাকী যাহা দেখা যাইতেছে তাহা গড্ডলিকাপ্রবাহ।

The communal ego is idealised as the soul of the nation, the race, the community. সমষ্টিগত অহমিকা রোমক, নর্ডিক, খৃষ্টীয়, ইউরোপীয় ইত্যাদি নানা নামে মানবের আত্মাকে, তাহার যথার্থ সত্তাকে, পেখিত করিতেছে। একরূপ অহমিকাকে মানবের আত্মা কিরূপে বলা যাইতে পারে! আত্মাপুরুষ যে ভেদজ্ঞানের বহু উর্দ্ধে অবস্থিত! শ্রীঅরবিন্দ সমষ্টিগত অহংকারকে

obscure collective being বলিতেছেন—
 অবচেতনা হইতে উথিত—উচ্চতর বৃহত্তর চেতনার
 সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। ইহা উত্তরণের
 পথ নয়; অবতরণের লক্ষণ এখানে স্পষ্ট—
 It is a reversion towards something
 Nature has left behind her.

একতাসাধনের আর এক প্রকার চেষ্টা মানব
 করিয়াছে অর্থনীতিক ভিত্তির উপর, কিন্তু তাহারও
 ধাৰা একই, জোর-জবরদস্তী, বাহির হইতে চাপ দিয়া
 মানুষকে একপ্রাণ করা, তাহার কর্মকে একমুখী
 করা। এরূপ কৃত্রিম একতা কয়দিন টিকিতে
 পারে! ব্যক্তিগত চেতনার প্রসার না আসিলে
 সমষ্টিগত মন-প্রাণ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে না।
 মনপ্রাণের অবাধ স্বচ্ছন্দ ক্রিয়া না আসিলে চেতনার
 প্রসারও আসিতে পারে না। যতদিন না উচ্চতর
 সূক্ষ্মতর বৃত্তি জাগিয়া উঠে ততদিন এই মনপ্রাণই
 আত্মার আচ্ছাদন ভূত, তাহাদের নমনীয়তা ও

কার্য্যকরী শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। ব্যক্তিগত স্বৈচ্ছাচার বা উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যাধি বটে, কিন্তু তাহার ঔষধ ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যনাশ নয়। ঔষধ তাহার চেতনার প্রসার, তাহার ব্যক্তিগত মনে বিশ্ব-জনীন ভাবের উদ্বোধন।

এরূপ মনে হইতে পারে যে ব্যক্তিকে স্বার্থত্যাগে অল্পপ্রাণিত করিয়া সমাজকে সুশৃঙ্খল সুনিয়ন্ত্রিত করিলেই নরজাতির চরম উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইল। কিন্তু মন-বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করিলেও ত আত্মার উন্নতি সাধিত হইল না! আত্মা কৃত্রিম শাসন নিয়মকে মানিয়া লইবে কেন, সে বিদ্রোহী হইয়া উন্নতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবে। গুরুবর বলিতেছেন, Man's true way is to discover his soul and its self-force and instrumentative অর্থ্যাৎ ষথার্থ ক্রমোত্তরণ সাধিত হইবে অন্তরস্থ আত্মাপুরুষের দ্বারা, তাহার শক্তির দ্বারা, মনোবুদ্ধির দ্বারা নয়।

আর এক বিপদ আছে। মানুষের মন সমাজের ও জীবনের যান্ত্রিক আদর্শের উপর বিরক্ত হইয়া শুদ্ধ ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আদর্শের দিকে ফিরিতে পারে। কিন্তু ধর্মসংঘটনের দ্বারা ত সমগ্র মানব সমাজকে পুনর্গঠিত করা যায় না! ব্যক্তিগতভাবে মানুষ কতকটা স্বল্প অনুভূতি পাইতে পারে—
 can provide a means of inner uplift for the individual—কিন্তু সমাজের আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। হয়ত মানুষ সেই ধর্মের মূল-নীতিগুলিকে মোটামুটি মানিয়া লইবে, সেই নীতিদ্বারা আপন গার্হস্থ্য ও সমবেত জীবনের নিয়মন করিবে, ধর্মের বিধান অনুযায়ী ক্রিয়াকর্ম করিবে, কিন্তু সমগ্র জীবন ধারার অভিব্যক্তি পিছনে পড়িয়া থাকিবে। বার বার পৃথিবীতে এইরূপ হইয়াছে। It does not transform the race, it cannot create a new principle of existence—এরূপে সমগ্র জাতির আমূল পরিবর্তন ঘটে না, জীবনে একটা

ভাগবত-জীবন

৬৭

নবীন নীতির প্রবর্তন হয় না। তাহা হইলে চাই কি? গুরুবরের ভাষায়—A total spiritual direction given to the whole life and the whole nature can alone lift humanity beyond itself—আমাদের সমগ্র প্রাণ ও সমগ্র স্বভাবকে পূর্ণভাবে চালিত করিতে হইবে আধ্যাত্মিক পথে, তবেই মানব তাহার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী পার হইয়া উর্দ্ধে উঠিতে পারিবে।

এই ধর্মসংঘটনেরই অনুরূপ আর এক উপায় মানুষ অবলম্বন করিয়াছে আপন উত্তরণের জন্ত। তাহা ধার্মিক সাধুপুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সাম্প্রদায়িক জীবন। কিন্তু এ উপায়ও ব্যর্থ হইয়াছে। এখানেও মন দেহপ্রাণকে বাগ মানাইতে পারে নাই। মন অপেক্ষা সূক্ষ্মতর বৃত্তিকে মনের স্থানে অধিষ্ঠিত না করিলে, অন্তঃপুরুষের পূর্ণ অধিকার স্থাপিত না হইলে, মানুষ প্রকৃতির নিয়তি-নির্দিষ্ট অভিব্যক্তির সহিত তাল রাখিতে পারিবে না। তাহার বর্তমান সসীম

মনপ্রাণ পদে পদে তাহার গতি ব্যাহত করিবে।
 আনাদের সত্তার, আমাদের অন্তরের, আমূল পরিবর্তন
 করিতে হইবে। হয়ত মনে হইবে যে একরূপ পরিবর্তন,
 দিব্যমানসের প্রতিষ্ঠা, সুদূরপর্যাহত। কিন্তু সে
 আশঙ্কা অমূলক—কেন না যে বিজ্ঞান, যে দিব্যচেতনা,
 এই পরিবর্তন সাধিবে তাহা আমাদের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন
 রহিয়াছে। আমাদের কাজ সেই সুস্থ চেতনা, সুস্থ
 জ্ঞানকে জাগান। কাজ কঠিন সন্দেহ নাই, কিন্তু
 অসম্ভব বা দূরপর্যাহত নয়। উপরন্তু প্রথমাবধি,
 নিশ্চয়তন জড়ের অবস্থা হইতেই, ক্রমোত্তরণের গতি
 এই দিকে, পৃথিবীর সমস্ত অতীত জীবন আমাদের
 উত্তরণের এই ধাপ চড়িবার জন্য প্রস্তুত করিয়া
 আসিয়াছে। তথাপি এ ধাপ ধীমান মানুষকে
 চড়িতে হইবে স্বৈচ্ছায়, জানিয়া বুঝিয়া। গুরুবর
 বলিতেছেন, What is necessary is that there
 should be a turn in humanity felt by
 some or many towards the vision of

ভাগবত-জীবন

৬৯

this change, a feeling of its imperative need, the sense of its possibility, the will to make it possible in themselves and to find the way, অর্থাৎ মানুষের অনেককে এই পরিবর্তনের সম্ভবনীয়তা, একান্ত প্রয়োজনীয়তা, হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে ও যত্নপূর্বক উপায় নির্ধারণ করিতে হইবে। এই কথাটি খুব ভাল করিয়া বোঝা চাই। ক্রমোন্নতির প্রথম ধাপগুলি জীবজগৎ চড়িয়া আসিয়াছে আপন প্রবৃত্তিবশে ও আবেষ্টনের প্রভাবে। সে সমস্ত জীবের বুদ্ধিবৃত্তি ছিল না। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিজীবী প্রাণী তাহাকে উঠিতে হইবে জ্ঞানতঃ, স্বেচ্ছায়। সে পরিবর্তনের প্রয়োজন বুঝিবে, পরিবর্তন সম্ভবপর মনে করিবে, তাহার পরিবর্তনের একান্ত ইচ্ছা হইবে, তবে সে উপায় খুঁজিয়া বাহির করিবে। সকল মানুষ যে একসঙ্গে এই কাজ সাধিবে তাহা নয়। যাহারা বুঝিবে, ইচ্ছা করিবে, তাহারাই যাত্রারম্ভ করিবে। জাতির মহা সঙ্কটকাল

যতই নিকটে আসিতেছে, ততই আমূল পরিবর্তনের ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ইচ্ছা একান্ত ও একাগ্র হইলে তাহার উত্তর নিশ্চয়ই আসিবে দিব্যালোক হইতে।

তবে উত্তর ব্যক্তিগতভাবে আসিতে পারে। এখানে সেখানে দুই-চারিজন মানুষ বিজ্ঞানময় জীবনে উন্নীত হইতে পারে। এইরূপ প্রবুদ্ধ মানব, 'গুরুবর বলিতেছেন, must either withdraw into their secret divine kingdom and guard themselves in a spiritual solitude or act from their inner light on mankind for what can be prepared in such conditions for a happier future. অর্থাৎ তাহাদিগকে গোপনে রভসে আপন দিব্য রাজ্যে বাস করিতে হইবে এবং আপনার শুচিতা বাঁচাইয়া যতটুকু সম্ভব জাতির উত্তরণের জন্ত কাজ করিতে হইবে। সমষ্টিগতভাবে কাজ তখনই হইতে পারিবে যখন এইরূপ কয়েকজন মানুষ, সমভাবাপন্ন,

সমমতাবলম্বী, আপন স্বতন্ত্র সমাজ গড়িয়া অন্তরের
 প্রেরণা অনুযায়ী জীবন বাপন করিবে। অতীত কালে
 মঠ আশ্রম ইত্যাদি এইরূপেই স্থাপিত হইয়াছিল।
 তবে মঠ মানে মুক্তিকামী সংসারত্যাগী বিরক্তজনের
 সংঘটন। অভিব্যক্তির পথে সমাজকে সংসারকে
 নূতন করিয়া গড়িয়া তোলাতে ইহাদের কি উৎসাহ
 থাকিতে পারে! যতদিন অবিद्या, অজ্ঞান, সাধারণ
 মানবের দেহপ্রাণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে,
 ততদিন জনকয়েক সন্ন্যাসীর আশ্রমজীবন সমগ্র
 জাতির উদ্ধার সাধিতে পারিবে না। সম্প্রদায়ের
 ক্রমিক অধঃপতন হইবে, বাহিরের অসঙ্গতি, অপূর্ণতা,
 অবশেষে মঠজীবনকেও অভিভূত করিবে। ইতিহাসে
 ইহা বহুবার দেখা গিয়াছে।

শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে একসঙ্গে অনেকগুলি
 লোকের অন্তরে মানসের স্থানে অতিমানস, চেতনার
 স্থানে প্রচেতনার অধিষ্ঠান না ঘটিলে, তাহাদের
 দেহপ্রাণ রূপান্তরপ্রাপ্ত না হইলে, জগতে নবজীবনের

প্রতিষ্ঠা হইবে না—an entirely new consciousness in many individuals transforming their whole being, transforming their mental vital and physical nature self, is needed for the new life to appear.

শ্রীঅরবিন্দ বার বার স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে নবজীবনের পূর্ণ অভ্যুদয় কিছু সর্বত্র একসাথে হইবে না। প্রথম প্রথম নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া নবীন সমাজকে চলিতে হইবে। সাধারণ জীবনে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা সময়সাপেক্ষ। ব্যক্তিগত উত্তরণ দ্রুত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে জগতের বিশেষ লাভ নাই। কেন না কয়েকজন এইরূপে ব্যক্তিগত সাধনার দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্ত মানুষ একত্র মিলিত হইয়া ক্ষুদ্র আদর্শ সমাজ স্থাপিত করিলেও তাহা টিকিবে না। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি সেই সমাজে তাহার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে আনিবে বহুগুণ পরিবর্দ্ধিত রূপে, তাহার পূর্বতন প্রকৃতির যত কিছু সমস্তা, যত কিছু বিরোধ, অসঙ্গতি,

অপূর্ণতা। গুরুবরের ভাবায়, would bring in not only his capacities but his difficulties and the oppositions of the old nature and mixed together in the restricted circle of a small and close common life, these might assume a considerably enhanced force of obstruction. এইভাবে মানবের পূর্বতন বহু প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু যদি প্রকৃতি উত্তরণের জন্য প্রস্তুত থাকেন, এবং যদি উদ্ধ হইতে অবতীর্ণ দিব্যশক্তির সহায়তা মিলে, ত উপরি-উক্ত বাধাসমূহ সরিয়া যাইবে, মানব জাতির পূর্ণ অভিব্যক্তির পথ উন্মুক্ত হইবে।

এখন দেখিতে হইবে যে বিজ্ঞানে জাগ্রত মানব সমাজ চারিদিকে তমসাচ্ছন্ন মনোময় মানবের জীবনের মাঝে কিভাবে পরিণতি লাভ করিতে পারিবে। এই দুই জীবনধারা যে পরস্পরবিরোধী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পাশাপাশি দুই ধারা চলিলে তাহারা পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিবেই। বিজ্ঞান-

ময়ের প্রভাব বেশী হইবে, মনোময়ের প্রভাব কম, কিন্তু উভয়ের সংস্পর্শের ফলে কতকটা আদান প্রদান মিটমাট ঘটিতে বাধ্য। সংঘর্ষ ও ঝগড়াঝাটি লাগার সম্ভাবনা আছে, কেন না নিম্নতর মনোময় মানবের স্বভাবই বিবাদ-বিসংবাদ। তবে এ ক্ষেত্রে তাহার পরাজয় অবশ্যসম্ভাবী, কেন না প্রতিপক্ষের শক্তি তাহার শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী। গুরুবর বলিতেছেন যে বিজ্ঞানময় সমাজের একেবারে পৃথক থাকিবার প্রয়োজনও হইবে না। It might establish itself in so many islets and from there spread through the old life, throwing out upon it its own influence and filtrations, gaining upon it, bringing to it help and illumination. অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়া চতুর্স্পর্শস্থ পুরাতন জীবন ধারার উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিবে, নবীন আলোকে পুরাতনকে উদ্ভাসিত করিবে। ধীরে ধীরে সাধারণ

মানবসমাজ এই নূতন শক্তির প্রভাব, তাহার আলোক তাহার সামর্থ্যকে চিনিতে শিখিবে।

মধ্যযুগী কালে এইরূপ সব গুণগোল হইবে, কিন্তু পরিণাম অবশ্যস্বার্থী। অভিব্যক্তির জয়-জয়কার হইবেই, জগতে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা নিয়তি-নির্দিষ্ট। এই উচ্চতর চেতনার শক্তি ও জ্ঞান উভয়ই এমন যে তাহা নবীন gnostic সমাজে অন্তরের একত্ব ত আনিবেই, উপরন্তু জীবনের প্রাচীন ও নবীন, দুই ধারারও সামঞ্জস্য বিধান করিবে। গুরুবরের কথায়, it would be sufficient to ensure a dominating harmony and reconciliation between the two types of life—অতিমানসের দিব্যভাতি মানসের অন্ধকার দূর করিবে। বিজ্ঞানময় মানবের জীবন পৃথক থাকিলেও তাহার মধ্যে অপরের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ থাকিবে না। যে পারিবে সে প্রবেশ করিবে, কিন্তু যে বাহিরে থাকিবে সেও দিব্য-মানবের সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইবে না, দিব্যজ্যোতির

আলোকে সে আপন মনোময় জীবনেই পূর্ণতর সঙ্গতি
 সাধিতে শিখিবে। মনের শক্তির সীমা আছে, কিন্তু
 তুলিলে চিনিবে না যে দিব্য অতিমানস আমাদের এই
 সসীম মনের মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে। এই প্রস্তুত
 দিব্যচেতনাই নবীন জগতে নবীন জীবনের স্বরূপ ও
 চিন্তাধারা সত্যের আলোকে নির্ধারিত করিবে।
 গুরুদেবের ভাষায়—The supramental principle
 in Supernature would itself determine
 according to the truth of things the
 balance of a new world-order. মনের
 অহংজ্ঞান গেলেই মানুষ উর্দ্ধে উঠিবে, দিব্য-জ্যোতির
 প্রকাশে তাহার দিব্য-চেতনা ফুটিয়া উঠিবে। দিব্য-
 চেতনাতে বিরোধ অসঙ্গতি নাই, জ্ঞান সেখানে
 অথও আত্মজ্ঞান, পূর্ণ বিশ্বজ্ঞান—unified self-
 knowledge, প্রবুদ্ধ মানবের জীবন নিজের জন্ত নয়,
 সমাজের জন্ত নয়, রাষ্ট্রের জন্ত নয়, মানবজাতির
 জন্তও নয়, শুধু পরম সত্যের জন্ত, বিশ্বাতীতের ইচ্ছার
 প্রকাশের জন্ত। তাহার মনে আপন পরের দ্বন্দ্ব নাই,

কেন না তাহার পরিপূর্ণ একত্বের অন্তর্ভুক্তি হইয়াছে। একের ও বহুর মধ্যে অসঙ্গতি নাই, কেন না সে জানে উভয়ই বিশ্বাতীত চরম সত্যের বিকাশ। গুরুবর বলিতেছেন—A gnostic super-nature transcends all the values of our normal ignorant nature—অর্থাৎ বিজ্ঞানময় জীবনের পরাপ্রকৃতিতে আমাদের সাধারণ অজ্ঞান প্রকৃতির মোহ-অন্ধকারের কোন চিহ্নই থাকিবে না। তথাপি এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে নিম্নপ্রকৃতি উচ্চপ্রকৃতিরই রূপান্তর, বিকৃতি। তাই ইহা পূর্ণ অজ্ঞান নয়, অর্দ্ধ জ্ঞান। ইহার নিম্নতর প্রকট ধারার পশ্চাতে যে আধ্যাত্মিক সত্য প্রচ্ছন্ন আছে, তাহাই দিব্য চেতনাতে প্রকাশ লইবে। তখন অবিচার আবরণ থাকিবে না, পূর্ণ সত্যের জ্যোতিতে মনপ্রাণ আলোকিত হইবে, তাহার চিন্তাধারা ও কার্যধারা পরিপূর্ণ সঙ্গতি এবং পরম জ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত হইবে।

ভাগবত-জীবন ত নিষ্ক্রিয় হইবে না ! বিরোধ-
 দ্বন্দ্ব অসঙ্গতি থাকিবে না সত্য, কিন্তু দিব্য মানবের
 কর্মের ধারা অব্যাহত থাকিবে । মোহাচ্ছন্ন মনের
 অস্পষ্ট উপলব্ধি, অস্পষ্ট চিন্তাধারা, অতিমানসে পূর্ণতা
 প্রাপ্তিলতা ও সার্থকতা লাভ করিবে । তার কার্যক্রম
 সম্বন্ধে গুরুবর বলিতেছেন, The affirmation of
 the Divine in himself and sense of the
 Divine in others and the sense of
 oneness with humanity, with all other
 beings, with all the world because of the
 Divine in them and a lead towards a
 greater and the better affirmation of the
 growing Reality in them will be part of
 his life-action—অর্থাৎ সে সারা বিশ্বের ও আপন
 হৃদিস্থিত ব্রহ্মের অঞ্চল একত্ব উপলব্ধি করিবে এবং
 অন্তরের ক্রমবর্ধমান সত্যাহুত্বের প্রেরণায় সকল
 কার্য্য করিবে ।

দিব্য মানবের সমস্ত প্রেরণা আসিবে চরম সত্যের

ভাগবত-জীবন

৭৯

উপলব্ধি হইতে। সেই উপলব্ধির সহিত অসমঞ্জস
 বাহ্য কিছু মনে আছে, তাহা ধীরে ধীরে দূরে চলিয়া
 যাইবে। Much that is normal to human
 life would disappear—কত মানসী প্রতিমা, কত
 আদর্শ, কত নীতি, কত ভাবধারা বাহ্য আত্ম আমাদের
 সর্বস্ব, তাহার অনেক কিছু দিব্য মানসে একেবারে
 বাতিল হইয়া যাইবে। বাহ্য থাকিবে, তাহারও
 বিস্তর রূপান্তর ঘটিবে। হিংসা ঘৃণা, যুদ্ধবিগ্রহ,
 অত্যাচার অনাচার, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, মিথ্যাচার,
 অজ্ঞান, অক্ষমতা, বিশৃঙ্খলা—এসব নবমানবের জীবনে
 থাকিতে পারিবে না। শিল্পকলাদি থাকিবে, কিন্তু
 মানুষের মানসিক বা দৈহিক সুখের জন্ম নয়,
 সত্যসুন্দরের প্রকাশ বলিয়া। মানুষের দেহপ্রাণের
 অন্বেষণ অসঙ্গত আদ্য, দাবীদাওয়া, শেষ হইয়া
 যাইবে। তাহার থাকিবে আত্মাকারী ভূতরূপে
 সত্যের প্রকাশের জন্ম। জড় পদার্থও সেইরূপ
 থাকিবে জগতে অচল ধ্রুব সত্তার প্রকাশ রূপে—

The control and the right use of physical things would be a part of the realised life of the spirit in the manifestation in earth-nature.

এই যে দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত মানবের নবজীবন, ইহা কি সন্ন্যাসী তপস্বীর জীবনের মত হইবে! ইহার মূল নীতি কি হইবে কুচ্ছ সাধনা? গুরুবর বলিতেছেন যে ইহা ভ্রান্তধারণা; এ ধারণার মূলে রহিয়াছে অজ্ঞান ও কামনার বশবর্তিতা—a standard based on the law of ignorance of which desire is the motive. দিব্য জীবনে যে গুণ অবশ্য থাকিবে তাহা শুচিতা ও আত্মসংযম। এ গুণ দরিদ্রেরও থাকিতে পারে, শ্রীমন্তেরও থাকিতে পারে।

Self-expression of the spirit, the will of the Divine Being—আত্মপুরুষের আত্ম-প্রকাশ, ভগবানের ইচ্ছা—এই দুইটি জিনিস দিব্য-জীবনে ফুটিয়া উঠিবে। তাহা অত্যন্ত সরল সাদাসিধে

ভাগবত-জীবন

৮১

জীবনেও হইতে পারে, ভোগের আবেষ্টনে বড়মানুষী
জীবনেও হইতে পারে। তিনটী প্রধান লক্ষণ মনে
রাখিতে হইবে দিব্য জীবন ধারার—বৈচিত্র্য, স্বাতন্ত্র্য
ও সঙ্গতি—তিনেরই মূলে অথও একত্ববোধ।

ভবিষ্যতের বিজ্ঞানে প্রবুদ্ধ মানব ও আজিকার বা
আগেকার দিনের তথাকথিত অতিমানব, ইহাদের
লক্ষণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অতিমানব বলিলে বোঝায়
অসীম শক্তি, নিঃস্বমতা, প্রচণ্ড অহমিকা ও জগৎকে
আপন আয়ত্তাধীন করিবার আগ্রহ ও সামর্থ্য। ইহা
ত মানবের অভিব্যক্তি নয়, ইহা আদিম বর্বরতার
প্রত্যাগমন। কালের গতিতে একদিকে যেমন
দেবমানবের উদ্ভব হইতে পারে, অপরদিকে তেমনিই
অসুর বা রাক্ষস মানবের আকির্ভাব হইতে পারে।
কিন্তু রাক্ষস ত উত্তরণের পথে দেখা দিবে না, দিবে
অবনতির পথে। গুরুবর আশ্বাস দিতেছেন যে পৃথিবীর
আর অসুর যুগে প্রত্যাবর্তন ঘটবে না—ভবিষ্যতের
মানব হইবে দেবোপম, তাহার জীবন প্রতিষ্ঠিত হইবে

দিব্যজ্ঞানের উপর—ইহা নিয়তি-নির্দিষ্ট। অজ্ঞানে
অবিদ্যায় ভেদে এতাবৎ কাল জগতের ক্রমোত্তরণ
চলিয়াছে। ভবিষ্যতে তাহা চলিবে জ্ঞানের সমুজ্জল
জ্যোতিতে, অবিদ্যা অজ্ঞান দূরে অপসারিত হইবে।

“জগন্নাথের রথ”—এ শ্রীঅরবিন্দ একদিন লিখিয়া-
ছিলেন, “যেদিন জ্ঞান কৰ্ম ও ভাবের সামঞ্জস্য ও
একীকরণে আত্মগত ঐক্য দেখা দিবে, সমষ্টিগত
বিরাট-পুরুষের ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায় সেদিন জগন্নাথের
রথ জগতের রাস্তায় বাহির হইয়া দশ দিক আলোকিত
করিবে। সত্যযুগ নামিবে পৃথিবীর বক্ষে, মর্ত্য
মানুষের পৃথিবী হইবে দেবতার খেলার শিবির,
ভগবানের মন্দির-নগরী, temple city of God—
আনন্দপুরী।”

প্রিণ্টার :—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২০৩১১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

